প্রবন্ধ সংকলন

যুক্তির আলোয়

বিজ্ঞান, সমাজ ও যুক্তিবাদ বিষয়ক নির্বাচিত প্রবন্ধ

প্রথম খণ্ড

অনাবিল সেনগুপ্ত

বিজ্ঞান-লেখক · যুক্তিবাদী কর্মী

সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

সম্পাদিত ও তথ্য-যাচাইকৃত সংস্করণ · ২০২৬

anabilsengupta.com

যুক্তির আলোয়

বিজ্ঞান, সমাজ ও যুক্তিবাদ বিষয়ক নির্বাচিত প্রবন্ধ

প্রথম খণ্ড

অনাবিল সেনগুপ্ত

২০২৬

© ২০২৬ অনাবিল সেনগুপ্ত

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রথম সংস্করণ, ২০২৬।

প্রকাশক: অনাবিল সেনগুপ্ত।

ওয়েবসাইট: https://anabilsengupta.com/

এই গ্রন্থের রচনাগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংবাদপত্রে (আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল, গণশক্তি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, পূর্বের কলম প্রভৃতি) প্রকাশিত হয়েছিল এবং এখানে সম্পাদিত ও তথ্য-যাচাইকৃত রূপে সংকলিত হল। মূল রচনার

বক্তব্য, যুক্তি ও লেখকের মতামত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে; কেবল ভাষা, বিন্যাস ও তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে সীমিত সম্পাদকীয় পরিশ্রম যুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থের কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোনও রূপে পুনরুৎপাদন বা প্রচার করা যাবে না।

লেখক পরিচিতি

অনাবিল সেনগুপ্ত পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, নেশায় লেখক, বিজ্ঞান-লেখক ও যুক্তিবাদী কর্মী। কারিগরি বিদ্যার শৃঙ্খলা এবং যুক্তিনিষ্ঠ অনুসন্ধানের স্বভাব—এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই তাঁর লেখালেখির জগৎ গড়ে উঠেছে। দীর্ঘকাল ধরে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে কুসংস্কার, অলৌকিকতার দাবি ও ধর্মের নামে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে জনসচেতনতামূলক প্রচারে অংশ নিয়েছেন।

বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবিকতা, জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে তাঁর কলম নিয়মিত ধরা দিয়েছে বাংলার প্রধান সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকার পাতায়। প্রবন্ধ, প্রচারপত্র ও সংবাদভাষ্যের মধ্য দিয়ে তিনি জটিল বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক বিষয়কে সাধারণ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তুলতে চেয়েছেন—কখনও তথ্যের আলোয়, কখনও তীব্র যুক্তির ধারে।

তাঁর কাজের পরিচায়ক সূত্র: “কৌতূহলী স্বভাবে। লক্ষ্যে চালিত।” লেখক ও তাঁর রচনা সম্পর্কে আরও জানা যায় তাঁর ওয়েবসাইটে:

https://anabilsengupta.com/

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় নিবেদন
- লেখকের কথা
- পাঠকের প্রতি নোট
- ভূমিকা
- অধ্যায় ১ — পশুবলি: ধর্ম, নৈতিকতা ও যুক্তি
- অধ্যায় ২ — সাপের কামড়: বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য
- অধ্যায় ৩ — বৃহৎ পুঁজির দায়বদ্ধতায়ই নীতি রূপায়ণের ধারাবাহিকতা
- অধ্যায় ৪ — মূর্তি ভাঙা: মতাদর্শের লড়াই?
- অধ্যায় ৫ — সংবাদমাধ্যমে অনাবিল সেনগুপ্ত
- অধ্যায় ৬ — প্রকাশিত গ্রন্থ, গবেষণা ও বৌদ্ধিক অবদান
- উপসংহার
- পরিশিষ্ট ক: তথ্য-যাচাই টীকা প্রসঙ্গে
- পরিশিষ্ট খ: উৎস ও সম্পাদকীয় নীতি
- তথ্যসূত্র

সম্পাদকীয় নিবেদন

এই সংস্করণে লেখকের উপলব্ধ রচনাসম্ভারকে বিষয়ভিত্তিকভাবে পুনর্বিন্যাস করে একটি পাঠযোগ্য গ্রন্থরূপ দেওয়া হয়েছে। মূল বক্তব্য, যুক্তির ধারা ও লেখকের স্বর সযত্নে সংরক্ষিত রেখে কেবল অনুচ্ছেদবিন্যাস, শিরোনাম, বিরামচিহ্ন ও দৃশ্যমান উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সীমিত সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

এই সংস্করণের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল তথ্য-যাচাইয়ের অতিরিক্ত স্তর। রচনায় উল্লিখিত পরিসংখ্যান, আইনি অবস্থান ও উদ্ধৃতির অনেকগুলিই স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী “সম্পাদকীয় টীকা” আকারে পাদটীকা সংযোজন করা হয়েছে। এই টীকাগুলি লেখকের বক্তব্যের বিরোধিতা করে না; বরং পাঠকের সুবিধার্থে হালনাগাদ তথ্য ও উৎস নির্দেশ করে মাত্র। মূল রচনার একটি বাক্যও এর ফলে বদলে দেওয়া হয়নি।

লেখকের কথা

বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নগুলিই এই সংকলনের কেন্দ্রবিন্দু। বিভিন্ন সময়ে লেখা প্রবন্ধ, প্রচারপত্র এবং সংবাদমাধ্যমে নথিভুক্ত উপস্থিতি—সবকিছু একত্রে এখানে উপস্থাপিত হল।

এই লেখাগুলি কোনও নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণের ফসল নয়; প্রতিটি রচনার পেছনে আছে একটি বিশ্বাস—যুক্তি ও তথ্যের আলোয় সমাজের অন্ধকার কোণগুলিকে দেখা সম্ভব এবং সেই দেখা থেকেই বদলের সূচনা হয়। পাঠক যদি এই রচনাগুলি পড়ে একবারও থমকে ভাবেন, প্রশ্ন করেন, কিংবা প্রচলিত ধারণাকে নতুন করে যাচাই করে দেখেন—তবেই এই সংকলনের সার্থকতা।

পাঠকের প্রতি নোট

সর্পদংশন-সহ এই গ্রন্থের চিকিৎসাবিষয়ক অংশগুলি মূল উৎসপাঠের ঐতিহাসিক নথি—নির্দিষ্ট সময়ে লেখা জনস্বাস্থ্য-সাংবাদিকতার দলিল। এগুলি বর্তমান ক্লিনিক্যাল নির্দেশিকা নয় এবং সেভাবে ব্যবহার্যও নয়। জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বদা বর্তমান সরকারি চিকিৎসা-নির্দেশিকা এবং প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের পরামর্শই অনুসরণ করতে হবে। বিশেষত সর্পদংশনের ওষুধ ও মাত্রা-সংক্রান্ত পদ্ধতি সময়ের সঙ্গে বদলেছে; তাই এই অধ্যায়ের কোনও তথ্যকেই প্রকৃত চিকিৎসা-সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে না।

ভূমিকা

বাংলার মননচর্চায় যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানের সহজ ভাষায় প্রচারের একটি দীর্ঘ, সম্মানজনক ঐতিহ্য আছে। ঊনবিংশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে বিংশ শতকের বিজ্ঞান-আন্দোলন পর্যন্ত এই ধারায় বারবার উচ্চারিত হয়েছে একটিই প্রত্যয়—প্রথা নয়, প্রমাণই হোক বিশ্বাসের ভিত্তি। অনাবিল সেনগুপ্তের এই সংকলন সেই ধারারই একটি সাম্প্রতিক অধ্যায়। এখানে সংকলিত রচনাগুলি মূলত সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশিত হয়েছিল, অর্থাৎ এগুলি নির্জন পাঠকক্ষের তত্ত্বচর্চা নয়—বরং জনপরিসরে, দৈনন্দিন বিতর্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে লেখা ভাষ্য।

সংকলনের প্রথম খণ্ডে বিষয়ের ব্যাপ্তি যথেষ্ট বিস্তৃত। ধর্ম ও যুক্তির সংঘাত ধরা পড়েছে পশুবলি বিষয়ক রচনায়, যেখানে লেখক ধর্মের নামে প্রাণীহত্যার নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী আন্দোলনের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। জনস্বাস্থ্যের প্রশ্ন এসেছে সর্পদংশন বিষয়ক রচনায়, যেখানে কুসংস্কার ও ওঝা-নির্ভরতার বদলে আধুনিক চিকিৎসার প্রতি আস্থার আহ্বান মুখ্য। এরপর রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রসঙ্গে বৃহৎ পুঁজি ও নীতি রূপায়ণের সম্পর্ক, মতাদর্শের লড়াই হিসেবে মূর্তি ভাঙার রাজনীতি, এবং সবশেষে লেখকের

নিজের সংবাদমাধ্যম-জীবন ও বৌদ্ধিক অবদানের পরিচয়। বিষয় বদলালেও রচনাগুলির অন্তঃসূত্র একটিই—যুক্তি, তথ্য ও মানবিকতার নিরিখে সমাজকে পরখ করা।

এই সংস্করণের একটি নতুন সংযোজন হল তথ্য-যাচাইয়ের কাঠামো। প্রতিটি রচনায় উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান, আইনি দাবি ও উদ্ধৃতি যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়েছে, এবং যেখানে তথ্য পুরনো হয়ে গেছে, ভুল প্রমাণিত হয়েছে কিংবা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি—সেখানে সম্পাদকীয় পাদটীকা যুক্ত হয়েছে। এই টীকাগুলির উদ্দেশ্য লেখকের মত খণ্ডন নয়; বরং লেখাটিকে তার মূল রূপে অক্ষত রেখে পাঠকের হাতে সাম্প্রতিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য তুলে দেওয়া। ফলে এই গ্রন্থ একই সঙ্গে দুটি জিনিস—একজন যুক্তিবাদী লেখকের সংবাদপত্রীয় রচনার সংকলন, এবং সেই রচনাকে ঘিরে গড়ে ওঠা একটি স্বচ্ছ, যাচাইযোগ্য তথ্য-অবকাঠামো। পাঠক এই দুইয়ের সমন্বয়েই রচনাগুলিকে পড়বেন—এটুকুই সম্পাদনার প্রত্যাশা।

অধ্যায় ১ — পশুবলি: ধর্ম, নৈতিকতা ও যুক্তি

> "যখন দেবীর সম্মুখে বলির সকর্দম রক্ত সর্বাঙ্গে মাখিয়া সকলে উৎকট চিৎকারে ভীষণ উল্লাসে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে থাকে, তখন কি তাহারা মায়ের পূজা করে, না নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে যে হিংসারাক্ষসী আছে সেই রাক্ষসীটার পূজা করে?"
>
> —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[1]

যাঁরা পশুপাখির উপর অত্যাচার দেখলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, কিংবা সমাজের প্রতিটি নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন—তাঁদের কাছে অনুরোধ, নিচের লিফলেট ও লেখাগুলি একবার পড়ে দেখুন। আমাদের দেশে প্রতিবছর

[1] সম্পাদকীয় টীকা: এই উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনও নির্দিষ্ট রচনার সঙ্গে মিলিয়ে শনাক্ত করা যায়নি। সুলভ ডিজিটাল রবীন্দ্র-রচনাসংগ্রহ ও উদ্ধৃতি-সংকলনে এই সুনির্দিষ্ট বাক্যটির উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি; যদিও আচার-সর্বস্বতা ও ধর্মীয় নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এমন মনোভাব রবীন্দ্রনাথের সমাজভাবনার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। উদ্ধৃতিটির প্রামাণিকতা প্রামাণ্য মুদ্রিত সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা বাঞ্ছনীয়।

কয়েক কোটি নিরীহ পশু ও পাখিকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয় ধর্মের নামে।[2] এই হিংস্র প্রথার বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে হত্যার বিরুদ্ধে আমরা “ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি” এবং “হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন” সারা ভারত জুড়ে ২০০5 সাল থেকে লাগাতার প্রচার চালিয়ে আসছি। ফলাফলও মিলেছে: বহু মন্দির এই নির্মম প্রথা বন্ধ করে দিয়েছে, এবং সর্বোপরি সরকার ভারতীয় আইনের বদল করতে বাধ্য হয়েছে। এই আইনে বর্তমানে ভারতে ধর্মের নামে

[2] সম্পাদকীয় টীকা: “প্রতিবছর কয়েক কোটি” পশু-পাখি ধর্মের নামে হত্যার এই পরিসংখ্যানটি স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি। ভারতে ধর্মীয় বলিদানে নিহত পশু-পাখির কোনও সরকারি বা সমীক্ষালব্ধ পৃথক গণনা নেই (সাধারণ মাংস-শিল্পের হিসাব এর থেকে আলাদা)। এই ধরনের সংখ্যা মূলত যুক্তিবাদী ও প্রাণী-অধিকার আন্দোলনের প্রচারসাহিত্যে পাওয়া যায়; আকারগতভাবে তা অসম্ভব না হলেও প্রামাণ্য উৎস থেকে নিশ্চিত করা যায়নি।

পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ (বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন)।[3] আপনাদের মতো পশুপাখি-প্রেমী মানুষেরা এগিয়ে আসবেন, এই আশা রাখি।

---

[3] সম্পাদকীয় টীকা: এই বাক্যে বর্ণিত আইনি অবস্থানটি বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে মেলে না—ভারতে ধর্মের নামে পশুবলি জাতীয় স্তরে নিষিদ্ধ নয়। কেন্দ্রীয় আইন Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960-এর Section 28 স্পষ্টভাবে "কোনও সম্প্রদায়ের ধর্ম-নির্দেশিত পদ্ধতিতে" প্রাণী-হত্যাকে অপরাধের আওতার বাইরে রেখেছে। কয়েকটি রাজ্যের হাইকোর্ট বলিদান নিষিদ্ধ করলেও (হিমাচল প্রদেশ, ২০১৪; ত্রিপুরা, ২০১৯; ওড়িশা) সেগুলির কার্যকারিতা সীমিত বা স্থগিত—সুপ্রিম কোর্ট ২০১৯-এ ত্রিপুরা ও ২০২০-তে ওড়িশা হাইকোর্টের নির্দেশ স্থগিত করে, এবং ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে হিমাচল প্রদেশে বলিদান অব্যাহত থাকায় নতুন করে নোটিস জারি করে। জাতীয় স্তরে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলা ২০২৬-এর মার্চ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। অর্থাৎ বিষয়টি "বিচারাধীন" হলেও "সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ" বর্ণনাটি বর্তমান আইনের সঠিক পরিচয় নয়। সূত্র: LiveLaw (মার্চ ২০২৬), https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-issues-notice-on-pil-seeking-ban-on-killing-of-animals-in-the-name-

"যে পূজার বেদী রক্তে গিয়েছে ভেসে, ভাঙো ভাঙো আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে। ধর্ম-কারার প্রাচীর বজ্র হানো, এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[4]

এই পশুবলির বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী সমিতির আন্দোলন সম্পর্কে বিশদে জানতে নিচের লিঙ্কগুলি একবার দেখে নিতে পারেন:

1. https://blog.mukto-mona.com/2009/08/20/2170/
2. https://blog.mukto-mona.com/2010/08/12/9571/
3. http://rationalistsantoshsharma.blogspot.in/2013/10/blog-post_7308.html?m=1

---

of-religion-animal-sacrifice-temple-hindu-rituals-526187; Law Trend (ফেব্রুয়ারি ২০২৫), https://lawtrend.in/supreme-court-issues-notice-to-himachal-pradesh-government-over-allegations-of-animal-sacrifice/।

[4] সম্পাদকীয় টীকা: এই পঙ্‌ক্তিগুলিরও নির্দিষ্ট উৎস-কবিতা রবীন্দ্র-রচনাসংগ্রহে শনাক্ত করা যায়নি। ভাব ও ভাষার দিক থেকে এটি রবীন্দ্রনাথের সংস্কার-প্রয়াসী কবিতার ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও প্রামাণিকতা প্রামাণ্য মুদ্রিত সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা প্রয়োজন।

4. http://english.kolkata24x7.com/west-bengal/animal-sacrifice-ban-at-two-burdwan-temples

5. https://www.google.co.in/amp/www.catchnews.com/amp/kolkata-news/break-with-tradition-no-more-animal-sacrifice-in-two-west-bengal-temples-1449658372.html

6. https://groups.yahoo.com/neo/groups/aapn/conversations/messages/8678

7. http://www.prothom-alo.com/international/article/705295/বর্ধমানে-দুই-মন্দিরে-বন্ধ-হলো-পশুবলি

এই রচনাটি লেখকের যুক্তিবাদী-আন্দোলনের প্রচারমূলক লেখা ও প্রচারপত্র থেকে সংকলিত।

অধ্যায় ২ — সাপের কামড়: বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

> **পাঠকের প্রতি স্মারক**: এই অধ্যায়টি নির্দিষ্ট সময়ে লেখা জনস্বাস্থ্য-সাংবাদিকতার দলিল—বর্তমান ক্লিনিক্যাল নির্দেশিকা নয়। এখানকার ওষুধ, মাত্রা ও পদ্ধতি-সংক্রান্ত তথ্য সময়ের সঙ্গে বদলেছে। প্রকৃত জরুরি অবস্থায় সর্বদা নিকটতম হাসপাতাল, প্রশিক্ষিত চিকিৎসক এবং বর্তমান সরকারি সর্পদংশন-নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

সরকারি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্য দ্রুততার সঙ্গে নিন, এবং প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান—ভারতীয় আইন (যেমন Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, Drugs and Cosmetics Act, 1940 (Amendment 2008), IPC 420, IPC 302 বা IPC 303 ইত্যাদি) অনুযায়ী ওঝা, গুণিন, তান্ত্রিক বা জানগুরুর মতো বুজরুক তথা পরিকল্পিত হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে যেন দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।[5]

---

[5] সম্পাদকীয় টীকা: এখানে উল্লিখিত আইনগুলির মধ্যে Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 এবং Drugs and Cosmetics Act, 1940 (২০০৮-এর সংশোধনী-সহ) সঠিকভাবে বর্ণিত। IPC 420 (প্রতারণা) ও IPC 302 (হত্যা) প্রাসঙ্গিক ধারা। তবে IPC Section 303

বর্ষাকাল মানেই সাপের উৎপাত। সর্পদংশনের ঘটনাও এই সময়েই বেশি ঘটে। পরিসংখ্যান বলছে, আমাদের দেশে প্রতিবছর সাপের কামড়ে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়; বেসরকারি মতে সংখ্যাটি লক্ষাধিক।[6] অথচ অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি বিষধর সাপ থাকলেও

সুপ্রিম কোর্ট *Mithu v. State of Punjab* (১৯৮৩) মামলায় অসাংবিধানিক ঘোষণা করে বাতিল করেছে—ফলে এটি প্রয়োগযোগ্য আইন নয়। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে সমগ্র ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC) Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, তাই সব IPC ধারা এখন ঐতিহাসিক। সূত্র: India Code, https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1412।

[6] সম্পাদকীয় টীকা: “প্রায় ৫০ হাজার” বার্ষিক মৃত্যুর হিসাবটি নির্ভরযোগ্য গবেষণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—Million Death Study (Suraweera et al., *eLife*, 2020) ভারতে বছরে গড়ে প্রায় ৫৮ হাজার সর্পদংশন-মৃত্যুর অনুমান করেছে। তবে “লক্ষাধিক” (এক লক্ষের বেশি) বেসরকারি হিসাবটি কোনও প্রকাশিত মহামারি-সমীক্ষায় সমর্থিত নয়; এই সংখ্যা সম্ভবত মৃত্যুর বদলে মোট দংশন বা বিষক্রিয়ার ঘটনার সঙ্গে গুলিয়ে গেছে (ভারতে বছরে দংশনের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে দশ লক্ষেরও বেশি)। সূত্র: WHO (২০২০), https://www.who.int/news/item/10-07-2020-study-estimates-more-

পাঁচ বছরে সাকুল্যে দুই থেকে তিন জনের মৃত্যু হয়।[7] আসলে আমাদের দেশে এখনও বহু মানুষ সর্পদংশনের পর ডাক্তারের তুলনায় ওঝা, ঝাড়ফুঁকের উপরই বেশি ভরসা রাখেন। ফলে রোগীর গুরুত্বপূর্ণ প্রথম কয়েক ঘণ্টা বিনা চিকিৎসায় নষ্ট হয়ে যায়। সমীক্ষা অনুযায়ী, সাপে-কাটা রোগীদের মধ্যে মাত্র ২২ শতাংশ সরকারি হাসপাতালে আসেন।

---

than-one-million-indians-died-from-snakebite-envenoming-over-past-two-decades; eLife, https://elifesciences.org/articles/54076।

[7] সম্পাদকীয় টীকা: অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের তুলনায় বেশি বিষধর সাপ-প্রজাতি থাকা সত্ত্বেও মৃত্যু নগণ্য—তুলনাটির মূল বক্তব্য সঠিক। তবে “পাঁচ বছরে দুই-তিন জন” সংখ্যাটি বাস্তবের তুলনায় সামান্য কম; আধুনিক হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় সর্পদংশনে বছরে গড়ে ১-২ জন, অর্থাৎ পাঁচ বছরে মোটামুটি ৫-১০ জনের মৃত্যু হয়। সূত্র: List of fatal snake bites in Australia, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fatal_snake_bites_in_Australia।

ঘাতক

ভারতে প্রায় আড়াইশো প্রজাতির সাপ আছে, তার মধ্যে ৫২টি প্রজাতি বিষধর। এর মধ্যে আবার ৪০টিরও বেশি প্রজাতি সামুদ্রিক।[8] পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ছ-টি বিষধর প্রজাতির সাপ পাওয়া যায়। এর মধ্যে চারটি সাপের কামড়েই বেশি মৃত্যু হয়।

গোখরো

ফণাধর ও নার্ভ-বিষযুক্ত। এদের ফণার পিছনে ইংরেজি U অক্ষরের মতো একটি চিহ্ন থাকে, যাকে খড়ম-চিহ্নও বলা হয়। এদের কামড়ে ক্ষতস্থানে প্রচণ্ড

---

[8] সম্পাদকীয় টীকা: ভারতে মোট প্রজাতি ও বিষধর প্রজাতির সংখ্যা (আনুমানিক আড়াইশো/৫২) সাম্প্রতিক হিসাবের কাছাকাছি হলেও কিছুটা পুরনো দিকের। তবে "৪০টিরও বেশি সামুদ্রিক" দাবিটি সম্ভবত অতিরঞ্জিত—২০১৯ সালের একটি ট্যাক্সোনমিক পর্যালোচনা (Journal of Threatened Taxa) ভারতীয় জলসীমায় মোট ২৬টি সামুদ্রিক সাপের প্রজাতি নথিভুক্ত করেছে, যা "৪০+" থেকে অনেক কম। সূত্র: Mongabay-India (২০১৯), http://india.mongabay.com/2019/03/threatened-and-undocumented-sea-snakes-of-india।

ব্যথা হয় এবং জায়গাটি ক্রমাগত ফুলতে থাকে। এক ছোবলে ১৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিষ ঢালতে পারে।[9]

কেউটে

ফণাধর ও নার্ভ-বিষযুক্ত। এদের ফণার পিছনে থাকে পদ্মচিহ্ন। বিষের মরণডোজ ১৫ মিলিগ্রাম।

চন্দ্রবোড়া

এই সাপের বিষ রক্তকণিকা ধ্বংস করে। এটি বাংলার একমাত্র হিমোটক্সিক সাপ, এবং বাংলায় সবচেয়ে বেশি প্রাণ কাড়ছে এই সাপই। চেহারায় মোটা, রং

---

[9] সম্পাদকীয় টীকা: গোখরোর “এক ছোবলে ১৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত বিষ” তথ্যটি সম্ভবত যথেষ্ট কম। ভারতের “বিগ ফোর” সাপের বিষ-উৎপাদন নিয়ে একটি সাম্প্রতিক গবেষণা (*PLOS Neglected Tropical Diseases*) গোখরোর ক্ষেত্রে প্রতি দোহনে গড়ে প্রায় ১৩৬ মিলিগ্রাম (সর্বোচ্চ ৮০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত) বিষের কথা জানিয়েছে। প্রকৃত দংশনে সাধারণত এর চেয়ে কম বিষ ঢালে; সম্ভবত মূল উৎসে বিষ-উৎপাদন ও মারণ-মাত্রার সংখ্যা গুলিয়ে গেছে (১৫ মিলিগ্রাম বরং গোখরোর বিষের আনুমানিক মারণ-মাত্রার কাছাকাছি)। সূত্র: https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371%2Fjournal.pntd.0013676।

বাদামি বা কাঠের মতো, ফণাহীন; গায়ে চন্দন-হলুদ চাকা চাকা দাগ। এরা কামড়ালে রোগীর রক্ততঞ্চনের গোলযোগ দেখা দেয়। চিকিৎসায় দেরি হলে রোগীর কিডনি নষ্ট হতে থাকে, মূত্রে রক্ত এসে যায়।

কালাচ

এটি ভয়ংকর বিষধর, রহস্যময় সাপ। ফণাহীন, চেহারায় মাঝারি। গায়ের রং কালো, তার উপর সরু সরু সাদা ব্যান্ড। দিনের বেলা এদের প্রায় দেখাই যায় না; রাতে এরা খোলা বিছানায় উঠে আসে।

প্রাথমিক চিকিৎসা

প্রথমে রোগীকে আশ্বস্ত করতে হবে, কারণ রোগী তখন প্রবল আতঙ্কের মধ্যে থাকেন—আর আতঙ্কই মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। রোগীকে বোঝান, সাপের কামড়ে আক্রান্ত বহু মানুষ চিকিৎসার ফলে বেঁচে উঠেছেন; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যত কম নড়াচড়া হবে, তত কম হারে বিষ সারা শরীরে ছড়াবে। ফোন করে জেনে নিন, আপনার নিকটতম হাসপাতালে এ এস ভি (ASV), নিওস্টিগমিন, অ্যাট্রোপিন ও অ্যাড্রিনালিন আছে কি না। মাথায় রাখবেন, সাপের কামড়ের সম্পূর্ণ চিকিৎসা একটি ব্লক প্রাইমারি হেলথ সেন্টারেই সম্ভব। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসককে সাপের কামড়ের চিকিৎসা করতে

বলুন। রোগীর কথা জড়িয়ে যাওয়া, নাকি সুরে কথা বলা, চোখের পাতা পড়ে আসা—এই লক্ষণগুলি খেয়াল রাখুন এবং চিকিৎসককে জানান।

রুল অফ ১০০

সাপে কামড়ানোর ১০০ মিনিটের মধ্যে ১০০ মিলিলিটার এ এস ভি (ASV) শরীরে প্রবেশ করালে রোগী বেঁচে যাবেন।[10]

---

[10] সম্পাদকীয় টীকা: “রুল অফ ১০০”-এর কোনও ভিত্তি বর্তমান WHO বা ভারতের জাতীয় সর্পদংশন-চিকিৎসা প্রোটোকলে নেই। বর্তমান নির্দেশিকা কোনও নির্দিষ্ট মাত্রা-সময় সমীকরণে “বেঁচে যাবেন” এমন নিশ্চয়তা দেয় না; বরং রোগীর ক্লিনিক্যাল অবস্থা ও রক্ততঞ্চনের পরীক্ষার ভিত্তিতে পুনরাবৃত্ত মাত্রায় (response-based dosing) ASV প্রয়োগের কথা বলে। এই হিউরিস্টিকটি ঐতিহাসিক ও অনানুষ্ঠানিক—লেখকের “পাঠকের প্রতি নোট”-এ দেওয়া সতর্কবার্তাই এখানে প্রযোজ্য, এবং এটিকে প্রকৃত চিকিৎসা-সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। সূত্র: National Snakebite Management Protocol, National Health Mission, https://nhm.gov.in/images/pdf/guidelines/nrhm-guidelines/stg/Snakebite_QRG.pdf; WHO/SEARO, https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/india/health-topic-pdf/who-guidance-on-management-of-snakebites.pdf।

কী করবেন

1. শান্ত থাকবেন।
2. কাছাকাছি মানুষজনকে ডাকবেন।
3. হাতে ঘড়ি, চুড়ি বা বালা থাকলে খুলে ফেলতে হবে।
4. ক্ষতস্থান যতটা সম্ভব স্থির রাখতে হবে।
5. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে যেতে হবে।

কী করবেন না

1. কোনও রকম বাঁধন দেবেন না।
2. কামড়ের জায়গায় কোনও কেমিক্যাল লাগাবেন না।
3. কামড়ের স্থানে ঠান্ডা, গরম বা বরফ-জল দেবেন না।
4. কেটে-চিরে বিষ বের করার চেষ্টা করবেন না।
5. মনে রাখবেন, সাপ যখন কামড়ায় তার বিষ দাঁতের মাধ্যমে ইঞ্জেকশনের মতো সরাসরি শরীরের ভিতরে চলে যায়।
6. রোগী নিজে দৌড়ে বা সাইকেল চালিয়ে আসবেন না।
7. সাপ ধরে হাসপাতালে আনার দরকার নেই।

সাপ ঠেকাবেন কীভাবে?

1. বাড়ির চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখুন। চুনের সঙ্গে ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে ছড়িয়ে দিন—এর ঝাঁঝালো গন্ধে সাপ আসে না।
2. রাতে অবশ্যই বিছানা ঝেড়ে মশারি টাঙিয়ে শোবেন। দরজা-জানালার নিচে ফাঁকা জায়গায় কাপড় গুঁজে ভরাট করে রাখতে পারেন।
3. অন্ধকারে হাঁটাচলা করবেন না। হাতে লাঠি নিয়ে রাস্তা ঠুকে চলুন। হাততালি দিয়ে লাভ নেই, কারণ সাপের কান নেই।
4. জুতো পরার আগে সেটি অবশ্যই ঝেড়ে নিন। মাটির বাড়িতে ইঁদুরের গর্ত থাকলে তা বুজিয়ে ফেলুন।

"ওঝা, গুণিন, তান্ত্রিক বা জানগুরু"-দের উদ্দেশে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির তরফে রইল "২৫ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ"—যদি কেউ অলৌকিক (?) উপায়ে রোগ সারাতে পারেন! (চ্যালেঞ্জ সংক্রান্ত বিশদ তথ্য ও অন্যান্য সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন: www.srai.org)[11]

---

[11] সম্পাদকীয় টীকা: চ্যালেঞ্জটি বাস্তব—ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি (SRAI, প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে) অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণের জন্য নগদ পুরস্কার ঘোষণা করে থাকে। তবে দুটি বিষয় লক্ষণীয়: প্রথমত, ইংরেজি Wikipedia অনুযায়ী নথিভুক্ত পুরস্কারের অঙ্ক ৫০ লক্ষ টাকা (এখানে উল্লিখিত

প্রচারে অনাবিল সেনগুপ্ত। সংযুক্ত সম্পাদক, ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি।

---

২৫ লক্ষ সম্ভবত সংগঠনের ইতিহাসের কোনও আগের পর্যায়ের অঙ্ক)। দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত www.srai.org ওয়েবসাইটটি বর্তমানে এই সংগঠনের নয়—তা একটি সম্পর্কহীন মার্কিন পেশাদার সংস্থার ঠিকানা; সমিতির প্রকৃত অনলাইন উপস্থিতি sraiofficial.blogspot.com। সূত্র: Prabir Ghosh, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Prabir_Ghosh।

অধ্যায় ৩ — বৃহৎ পুঁজির দায়বদ্ধতায়ই নীতি রূপায়ণের ধারাবাহিকতা

(১লা আগস্ট, ২০২০; উত্তরবঙ্গ সংবাদ ও পূর্বের কলম সংবাদপত্রে অংশবিশেষ পূর্বপ্রকাশিত)

> ‘বিরোধীকে বলতে দাও... তোমার ভুলের ফর্দ দিক। বিরোধীর দৃষ্টি দিয়েও সবাই নিজের হিসেব নিক। যুক্তিকে বাঁচতে দাও... যুক্তির স্বচ্ছ আলোয় শানিয়ে নিচ্ছি আমার চোখ।”

করোনা পূর্ববর্তী ভারতের আর্থসামাজিক দুরবস্থা

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতে স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরেও সাম্প্রদায়িকতা, দেশজুড়ে অসহিষ্ণুতা, সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতায় প্রশ্নচিহ্ন, ধর্মনিরপেক্ষতার বিসর্জন, দৈনিক ৩৫ জন কৃষকের আত্মহত্যা, দলিত নির্যাতন, সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার — বঞ্চনা ও বৈষম্যের ঘটনা চরম হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নারী নির্যাতনে দেশ পৌঁছে গিয়েছিল বিপজ্জনক অবস্থায়। “লাভ জেহাদ” ও “গো-রক্ষা”র নামে অসহায় সাধারণ মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছিল। অপরিকল্পিত ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের ‘ডিমনিটাইজেশন’ এবং জিএসটি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের পথে নামিয়ে দিয়েছিল। গোটা দেশজুড়ে

অর্থনৈতিক মন্দা সাধারণ মানুষকে ঠেলে দিয়েছিল ছাঁটাই ও বেকারত্বের দিকে; বেকারত্বকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল ৪৫ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ জায়গায়।[12] সেই সময় দেশের মানুষকে ব্যস্ত রাখতে তাঁদের কাছে চাওয়া হচ্ছিল নাগরিকত্বের প্রমাণ! এরই মধ্যে কর্পোরেট শিল্পপতিদের কর্পোরেট করে ১০% ছাড় দেওয়া হয়েছে।[13] সব অরাজকতার মধ্যেই সুকৌশলে,

---

[12] সম্পাদকীয় টীকা: NSSO-র Periodic Labour Force Survey (PLFS) ২০১৭-১৮ অনুযায়ী দেশের বেকারত্বের হার ছিল ৬.১ শতাংশ — ১৯৭২-৭৩ সালের পর, অর্থাৎ ৪৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে ফাঁস হওয়া ও পরে সরকারিভাবে প্রকাশিত এই তথ্য দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে বহুল প্রচারিত এবং যাচাইয়ে নিশ্চিত (সূত্র: Business Standard, Al Jazeera, 31 January 2019)।

[13] সম্পাদকীয় টীকা: ২০১৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ঘোষিত কর্পোরেট কর হ্রাসের প্রকৃত কাঠামোটি ছিল এইরকম: ছাড় না-নেওয়া দেশীয় কোম্পানিগুলির মূল করহার ৩০% থেকে কমে ২২% (সারচার্জ ও সেস-সহ কার্যকর হার প্রায় ২৫.১৭%), এবং নতুন দেশীয় উৎপাদন সংস্থার জন্য ১৫%। প্রবন্ধের “১০% ছাড়” কথাটি এই কাঠামোরই সরলীকৃত প্রকাশ; শতাংশ-বিন্দুর হিসাবে হ্রাসটি প্রায় ৮ পয়েন্ট। অর্থ মন্ত্রকের নিজস্ব হিসাবে এতে বছরে রাজস্ব-ক্ষতি প্রায় ১.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা (সূত্র: PIB press release, 20

প্রতিবাদহীনভাবে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে বেচে দেওয়া হচ্ছিল কর্পোরেট কোম্পানিগুলির কাছে।

করোনা এলো দেশে আর্থিক প্যাকেজ নিয়ে

দেশের এই আর্থসামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেই গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল মারণ ভাইরাস করোনা; ক্রমশই সে প্রাণ কাড়তে শুরু করল একের পর এক মানুষের। অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক তামাশার পর হঠাৎ, অপরিকল্পিতভাবে লকডাউনের ঘোষণা করলেন দেশের প্রধানসেবক। এই আকস্মিক লকডাউনের ফলে পরিযায়ী শ্রমিক, রাস্তার ফেরিওয়ালা, দিনমজুর, হকার, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক — মোট শ্রমশক্তির সিংহভাগ জুড়ে থাকা অসংগঠিত ক্ষেত্রের এই মানুষগুলিই ক্ষতিগ্রস্ত হলেন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সুনামিতে। পরিযায়ী শ্রমিকদের মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ঘরে ফেরা এবং ফিরতি পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু দেশের সরকারের চরম অব্যবস্থার নিদর্শন হিসেবে ইতিহাসে থেকে যাবে। সামাজিক অব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা ছড়িয়ে পড়ল গোটা দেশজুড়ে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (WFP) সতর্কবাণী দিয়েছে — অর্থনীতি এভাবে চলতে থাকলে বিশ্বের অন্তত কয়েক কোটি মানুষ অনাহারে

September 2019)।

মারা যেতে পারেন।[14] কোভিড-১৯ কোটি কোটি মানুষের জন্য ডেকে এনেছে এক ভয়ংকর বিপর্যয়।

কিন্তু এই বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে দেশবাসীর জন্য আনা হল 'আত্মনির্ভর' হওয়ার প্যাকেজ। বলা হল, প্রায় ২০ লক্ষ কোটি টাকা দেশে খরচ করা হবে — যা কিনা জিডিপি-র ১০%! অথচ আর্থিক বিশ্লেষকদের হিসাবে সরকারের প্রকৃত খরচ হবে মাত্র ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি-র ১.১ শতাংশের বেশি নয়।[15] প্যাকেজের বেশির ভাগই ব্যাংকের ঋণ, নয়তো আগে থেকেই বাজেটে ধরে রাখা বরাদ্দ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — এই সংকটের

---

[14] সম্পাদকীয় টীকা: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (World Food Programme) নির্বাহী পরিচালক David Beasley ২০২০ সালের এপ্রিলে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সতর্ক করেন — ব্যবস্থা না নিলে ২০২০ সালের শেষে তীব্র খাদ্য-অনিরাপত্তার মুখে থাকা মানুষের সংখ্যা ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে বেড়ে প্রায় ২৬ কোটি ৫০ লক্ষে পৌঁছতে পারে; আশঙ্কা প্রকাশ করেন "biblical proportions"-এর দুর্ভিক্ষেরও। অর্থাৎ WFP-র নিজস্ব প্রক্ষেপণটি ছিল তীব্র ক্ষুধা ও খাদ্য-অনিরাপত্তার শিকার মানুষের সংখ্যা বিষয়ে — কয়েক কোটি মানুষের অনাহারে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস নয় (সূত্র: WFP statement to UN Security Council, April 2020)।

সময়েই সমস্ত ক্ষেত্রের দরজা বেসরকারি পুঁজির জন্য খুলে দেওয়ার ঘোষণা করা হল। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি সংস্থার হাতে; ব্যতিক্রম কেবল কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি, যার প্রতিটিতে থাকবে ন্যূনতম ১টি ও সর্বাধিক ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা — বাকি সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থাকবেই না। সব ক্ষেত্রেই খুলে দেওয়া হল বিদেশি বিনিয়োগের দরজা; এমনকি সামরিক ক্ষেত্রেও অনুমতি দেওয়া হল ৭৪% পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগের।[16] দেশের খনিজ, বনজ — সব সম্পদ নিলাম করে দেওয়া হবে

[15] সম্পাদকীয় টীকা: বিশ্লেষকদের এই ২,১৭,০৯৫ কোটি টাকার (জিডিপি-র প্রায় ১.১%) হিসাবটি কোনও নির্দিষ্ট নামাঙ্কিত সংস্থা বা অর্থনীতিবিদের প্রতিবেদনে খুঁজে পাওয়া যায়নি; মূল প্রকাশনায় যেমন ছিল, তেমনই রাখা হল। দিকনির্দেশের বিচারে অবশ্য এটি সমকালীন মূলধারার বিশ্লেষণের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ — একাধিক বিশ্লেষক প্যাকেজের প্রকৃত নতুন রাজকোষীয় ব্যয় জিডিপি-র আনুমানিক ১-১.৫ শতাংশ বলে হিসাব করেছিলেন (দ্রষ্টব্য: PRS Legislative Research-এর বিশ্লেষণ)। একইভাবে পরবর্তী পরিচ্ছেদের "৪২টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা" সংখ্যাটিও কোনও প্রাথমিক সূত্রে মেলানো যায়নি; সমকালীন প্রতিবেদনে ২৩টি সংস্থার কৌশলগত বিলগ্নিকরণে ছাড়পত্র এবং ৩০টি সংস্থার বেসরকারিকরণ-ভাবনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেসরকারি সংস্থার কাছে। আর কর্পোরেট কোম্পানিগুলিকে প্রদান করা হবে আর্থিক সহায়তা।

প্রত্যাশা ছিল, করোনায় বিধ্বস্ত অর্থনীতি আর বিপর্যস্ত দরিদ্রদের ঘুরে দাঁড় করাতে ত্রাণ প্রকল্পে নগদ জোগাবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন; সরাসরি টাকা দেবেন তাঁদের অ্যাকাউন্টে। কিন্তু সে পথে না হেঁটে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বেসরকারি কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। অর্থনীতিবিদদের অনেকের মতে, ব্যবসা করা সরকারের কাজ নয়; তাহলে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণ কিংবা বেসরকারিকরণে অসুবিধা কোথায়? কিন্তু সেই ঘোষণা এখন কেন? অনেকের জিজ্ঞাসা — রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারিকরণের পরিকল্পনাকে ত্রাণ প্রকল্পে ঠাঁই দেওয়া হল কেন? এমনও তো নয় যে এখনই বেশ কিছু সংস্থা বেচে সেই টাকা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কাজে ঢালছে কেন্দ্র! যখন বহু বেসরকারি সংস্থার নাভিশ্বাস দশা, ছাঁটাই হচ্ছেন বহু কর্মী, তখন এমন ঢালাও বেসরকারিকরণ কেন? করোনা-সংকটে দিন-

---

[16] সম্পাদকীয় টীকা: প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয় পথে (automatic route) প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা ৪৯% থেকে ৭৪%-এ উন্নীত করার সিদ্ধান্তটি যাচাইয়ে নিশ্চিত; ২০২০ সালের মে মাসে ঘোষিত এবং সেপ্টেম্বরে DPIIT-র প্রেস নোটে কার্যকর, জাতীয় নিরাপত্তা পর্যালোচনার শর্তসহ।

আনা-দিন-খাওয়া মানুষগুলির বিপুল ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টাই করল না সরকার — উল্টে বলা হল বেসরকারিকরণের কথা! লকডাউনের সময়ে কোনও বিতর্ক, কোনও আলোচনা ছাড়া এমন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ কী? তিলতিল করে গড়ে তোলা দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিই দেশকে মজবুত ও আত্মনির্ভর করেছে; এখন 'আত্মনির্ভর ভারতে'র নামেই সেই সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। এখানেই প্রশ্ন ওঠে — দেশের সাধারণ জনগণের ভয়ংকর সংকটের সময়েও সরকারের দরদ মুষ্টিমেয় পুঁজিপতি বা কর্পোরেট কোম্পানিগুলির জন্য উথলে ওঠে কেন?

সবই নীতি আয়োগের ইচ্ছে

সুযোগসন্ধানীরা যে-কোনো সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেই! করোনাভাইরাসের বিশ্বব্যাপী সংকটের মুহূর্তে দেশের সাধারণ জনগণের প্রতিবাদহীন অসহায়তার সুযোগে বৃহৎ পুঁজির তোষামোদকারীদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে বাধাহীন স্বেচ্ছাচারিতার এই অবকাশ। নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার ২০১৯ সালেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বিদেশি লগ্নিকারীদের খুশি হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। নিশ্চিত করে বলছি, বড় ধরনের একাধিক আর্থিক সংস্কার হবেই। চাকা গড়ানোর জন্য আমরা মাটিতে

অত্যন্ত জোরদার আঘাত করব।” আগামী দিনে এয়ার ইন্ডিয়া-সহ অন্তত ৪২টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পুরোপুরি বেসরকারিকরণ বা বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আগেই পেশ হয়েছিল ভারত পেট্রোলিয়াম (BPCL)-সহ ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণের প্রস্তাব। কয়েক দিন আগেই ২৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানির বিলগ্নিকরণে মিলে গেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত ছাড়পত্র। ইতিমধ্যে যে-সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিলগ্নিকরণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সবুজ সংকেত দিয়েছে, তার মধ্যে আছে এয়ার ইন্ডিয়া ও তার পাঁচ সহযোগী সংস্থা, ব্রিজ অ্যান্ড রুফ, পবন হংস, হিন্দুস্তান নিউজপ্রিন্ট লিমিটেড, ভারত আর্থ মুভার্স, ফেরো স্ক্র্যাপ নিগম, সিমেন্ট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, দুর্গাপুরের অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট, হিন্দুস্তান ফ্লুরোকার্বন, স্কুটার্স ইন্ডিয়া লিমিটেড প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় সরকার এবার বেসরকারি সংস্থা থেকে দক্ষ কর্মীদের এনে সরকারি উচ্চপদে বসাতে উদ্যোগী হয়েছে; যুগ্ম সচিব স্তরের পদে আবেদনের বিজ্ঞপ্তিও দিয়েছে। তিন বছরের চুক্তির ভিত্তিতে তাঁদের নিয়োগ করা হবে; ভালো কাজ করলে মেয়াদ বাড়তে পারে আরও দু’বছর। অথচ দেশের সংবিধান অনুসারে সর্বোচ্চ নিয়ামক UPSC পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাঁরা সাধারণত আইএএস হন, তাঁরাই পরবর্তীকালে পদোন্নতির মাধ্যমে উন্নীত হন সচিব পর্যায়ে। নীতি আয়োগ জানিয়েছিল, ২০১৭ থেকে ২০২০-র মধ্যে

নিয়োগের ক্ষেত্রে তারা এই ধরনের ’সংস্কার’ আনতে চায়। রাজস্ব, ইকনমিক সার্ভিস, ফিনান্সিয়াল সার্ভিস, পরিবেশ, কৃষি, বাণিজ্য, বিমান, সড়ক-সহ বেশ কিছু দপ্তরে এভাবেই নিয়োগ করা হবে। সংবিধানকে পাশ কাটিয়ে তোষামোদী, কর্পোরেট-বান্ধব আমলাবাহিনী নিয়ে বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত হয়ে যাবে। দেশের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর পদে আসীন হওয়ার স্বপ্নও কি তবে ‘বাইপাস’ হয়ে গেল?

গলায় যেন কাঁটা, বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত পরামর্শ

অর্থনীতিতে নোবেলজয়ী কলকাতার বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক ব্যানার্জি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের হাতে সরাসরি নগদ টাকা দেওয়ার পরামর্শ দেন সরকারকে। দেশের গরিব মানুষগুলির হাতে টাকা গেলে খরচের মধ্য দিয়ে তাঁদের সচ্ছলতা আসবে, ঘুরবে দেশের অর্থনীতির চাকাও। কিন্তু দেশের প্রধানসেবক থেকে নীচুতলার তথাকথিত ভক্তদের কটাক্ষ থেকে গালিগালাজ — অনেক কিছুই শুনতে হয় তাঁকে।

করোনাভাইরাসের জেরে ধুঁকতে থাকা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কেন্দ্রকে এমনই নানা পরামর্শ দিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান রেভিনিউ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের (IRS) প্রায় ৫০ জন আধিকারিক। ‘FORCE’ (Fiscal Options and Response

to COVID-19 Epidemic) নামে সেই পরামর্শগুলি তাঁরা পাঠিয়েছিলেন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেসের (CBDT) কাছে।[17] ওই আধিকারিকদের মতে, মহামারির ফলে যে সংকট তৈরি হয়েছে, সংক্ষিপ্ত ও মধ্যবর্তী মেয়াদে তার মোকাবিলার জন্য সরকারকে জোর দিতে হবে বাড়তি রাজস্ব আদায়ের উপর। অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য এই সময়ে ’অত্যন্ত ধনী’দের (সুপার রিচ) উপরও বিশেষ দায় বর্তায় বলে মত আধিকারিকদের। অন্যদের তুলনায় আয় অনেক বেশি হওয়ায় তাঁদের ব্যয়ের ক্ষমতাও বেশি; সাময়িক ধাক্কা কাটানোর মতো সংস্থানও তাঁদের আছে; অধিকাংশ উচ্চ-আয়ের মানুষের রয়েছে বাড়ি থেকে কাজ করার সুযোগও। সেজন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁদের উপর দুটি বিকল্প উপায়ে কর চাপানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন আধিকারিকরা:

---

[17] সম্পাদকীয় টীকা: IRS অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় ৫০ জন আধিকারিকের ‘FORCE’ (Fiscal Options & Response to COVID-19 Epidemic) শীর্ষক প্রতিবেদন এবং তার সুপারিশগুলি — এক কোটির বেশি আয়ে ন্যূনতম ৪০% কর, সম্পত্তি করের প্রত্যাবর্তন, বিদেশি সংস্থার উপর বর্ধিত সারচার্জ — যাচাইয়ে নিশ্চিত (এপ্রিল ২০২০)। অর্থ মন্ত্রক প্রতিবেদনটিকে অননুমোদিত বলে খারিজ করে; তবে সমকালীন প্রতিবেদন অনুযায়ী CBDT-র সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলাভঙ্গের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল মূলত তিনজন নামাঙ্কিত আধিকারিকের বিরুদ্ধে — স্বাক্ষরকারী পুরো দলটির বিরুদ্ধে নয়।

যাঁদের আয় এক কোটির বেশি, তাঁদের ন্যূনতম কর করা হোক ৪০ শতাংশ; অথবা যাঁদের পাঁচ কোটি বা তার বেশি মূল্যের সম্পত্তি আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা হোক সম্পত্তি কর। পাশাপাশি, উচ্চ আয়ের যে বিদেশি সংস্থাগুলির ভারতে শাখা বা স্থায়ী অফিস রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সারচার্জ বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়; বহুদিন ধরেই সেই সারচার্জের অঙ্ক বাড়ানো হয়নি। আধিকারিকদের যুক্তি — যেহেতু ওই সংস্থাগুলি এখান থেকে মুনাফা পাচ্ছে এবং তাদের সামনে রয়েছে ভারতের ক্রমবর্ধমান বাজারের সুযোগ, তাই তাদেরও ক্রেতাদের দিকটি বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু কর্পোরেট শিল্পপতিদের চটিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার অভ্যাস এই সরকারের নেই। তাই দেশের সাধারণ জনগণের শুভচিন্তক সুপারিশকারী আধিকারিকদেরই নিয়মভঙ্গের দায়ে শোকজ করা হয়েছে; বার্তা দেওয়া হচ্ছে — মুখ বন্ধ রেখে তাঁবেদারি করে যাও।

দেশের নির্বাচনে বৃহৎ পুঁজির নিবেশ

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে ভোট বলে কথা। নয়াদিল্লির সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ-এর (CMS) প্রকাশিত এক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, সদ্যসমাপ্ত ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে খরচের সম্ভাব্য পরিমাণ প্রায় ৬০,০০০ কোটি টাকা — যা এ-যাবৎ যে-কোনও দেশে হওয়া নির্বাচনের সব খরচকে ছাড়িয়ে

পৌঁছে গিয়েছে শিখরে।[18] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ২০১৬ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতায় আসার সময় খরচ হয়েছিল ৪৫ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি। এই খরচ ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে হওয়া খরচেরই দ্বিগুণ; ৫৪২টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটিতে খরচ হয়েছে গড়ে ১০০ কোটি টাকারও বেশি, ভোটপিছু প্রায় ৭০০ টাকা — যেখানে ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে এই খরচ ছিল ভোটারপিছু ৬০ পয়সা। নির্বাচনে হওয়া মোট খরচের ৪৫ শতাংশই ঢেলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) — প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা। সাধারণ বোধ থাকলেই বলা যায়, এত টাকা পার্টিকর্মীদের চাঁদা থেকে আসে না। কর্পোরেট পুঁজিপতি বন্ধুরা পাশে না

[18] সম্পাদকীয় টীকা: সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ-এর ‘Poll Expenditure: The 2019 Elections’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি বাস্তব ও বহুল-উদ্ধৃত। মোট ব্যয় আনুমানিক ৫৫-৬০ হাজার কোটি টাকা, কেন্দ্রপিছু গড়ে ১০০ কোটি, ভোটপিছু প্রায় ৭০০ টাকা এবং মোট ব্যয়ের প্রায় ৪৫% (আনুমানিক ২৭ হাজার কোটি) বিজেপির — এই মূল সংখ্যাগুলি প্রতিবেদন ও তার সমকালীন কভারেজের সঙ্গে মেলে। তবে ২০১৬-র মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের খরচ এবং ১৯৫২ সালের ভোটারপিছু ৬০ পয়সা — এই তুলনামূলক সংখ্যা দুটি CMS প্রতিবেদনে নেই এবং স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি।

থাকলে এখন এ-দেশে ভোট করা যায় না — এটাই বাস্তবতা, এবং এখানেই শুরু হয় দেনাপাওনার হিসাব।

দেশের সম্পদের মালিক কে

দেশের ৯৫ কোটি ৩ লক্ষ মানুষের, অর্থাৎ জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের, সম্পত্তির চার গুণ বেশি সম্পদের অধিকারী ১ শতাংশ ধনী। ভারতের এমন ভয়াবহ আর্থিক বৈষম্যের কথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফ্যাম।[19]

---

[19] সম্পাদকীয় টীকা: এই অনুচ্ছেদের পরিসংখ্যানগুলি প্রকৃতপক্ষে ২০১৭ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রকাশিত অন্তত চারটি পৃথক Oxfam প্রতিবেদন থেকে সংকলিত, যদিও মূল প্রবন্ধে একটিমাত্র সমীক্ষার মতো করে উপস্থাপিত। বিশদে: (ক) “৯৫ কোটি ৩ লক্ষ মানুষের (জনসংখ্যার ৭০%) সম্পদের চার গুণ” — Oxfam India-র জানুয়ারি ২০২০-র ‘Time to Care’ প্রতিবেদন থেকে, যথাযথভাবে উদ্ধৃত; (খ) মুকেশ আম্বানির ২.৮ লক্ষ কোটি টাকার সম্পদ ও তার সঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্য-শৌচ-জল খাতের তুলনা এবং “সেরা ৯ ধনী = দরিদ্রতম ৫০%” — জানুয়ারি ২০১৯-এর প্রতিবেদন থেকে, যথাযথ; (গ) শীর্ষ ১%-এর হাতে “৫৮.৪%” সম্পদ — এই সংখ্যাটি কোনও একক Oxfam India প্রতিবেদনের সঙ্গে হুবহু মেলে না: ২০১৭-র দাভোস প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল ৫৮%, আর জানুয়ারি ২০১৯-এর প্রতিবেদনে

তাদের প্রকাশিত সমীক্ষা অনুযায়ী, উচ্চশ্রেণির লোকেরা সংখ্যায় দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১% হয়েও দেশের ৫৮.৪% সম্পদের মালিক। দেশের ধনীতম ব্যক্তি মুকেশ আম্বানির সম্পদের পরিমাণ ২.৮ লক্ষ কোটি টাকা — যা কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, শৌচ এবং জল-বণ্টন খাতে আয় ও বরাদ্দের সম্মিলিত অঙ্কের থেকেও বেশি! দেশের সেরা ৯ জন ধনীর সম্পদের পরিমাণ দেশের ‘গরিব’ জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের সমান! আর্থিক বৈষম্য ঘোচানোর উদ্যোগের দিক থেকে ভারত বিশ্বের ১৫৭টি দেশের মধ্যে ১৪৭ নম্বরে! যে দেশে ভয়ংকর সংকটের মুহূর্তেও দেশের সম্পত্তি কর্পোরেট কোম্পানিগুলির হাতে হস্তান্তরিত করা হচ্ছে, সেই দেশে বৈষম্য ঘোচানো তো দূরস্থান — এই বৈষম্য আদৌ কোথাও গিয়ে থামবে কি? দেশের মানুষ কি আবারও ফিরে যাবে মুষ্টিমেয়দের “কোম্পানি রাজ”-এ?

৫১.৫৩%; (ঘ) “১৫৭টি দেশের মধ্যে ১৪৭তম” স্থানটি Oxfam ও Development Finance International-এর পৃথক ‘Commitment to Reducing Inequality Index’ (অক্টোবর ২০১৮) থেকে। অর্থাৎ প্রতিটি সংখ্যাই বাস্তব ও সূত্রনির্দেশযোগ্য, তবে ভিন্ন ভিন্ন বছরের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেদনের।

কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর ভবিষ্যতের বোঝা লাঘব

দেশে ১০৯টি রুটে ১৫১টি ট্রেন চালানোর দায়িত্ব বেসরকারি হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে মোদি সরকার। শর্তসাপেক্ষে টিকিটের দাম ঠিক করবে বেসরকারি সংস্থা; টিকিটে কোনও ছাড় থাকবে না। পরবর্তীতে ৫০টি স্টেশন বেসরকারি সংস্থার হাতে ছাড়ার প্রস্তাব আগেই গৃহীত হয়ে আছে। রেলের বিভিন্ন ডিভিশনের মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের মতো সেফটি, অপারেশন এবং মেনটেন্যান্স বিভাগেও মোট ঘোষিত পদের ১৫ শতাংশ কর্মিসংখ্যা কমানোর নির্দেশ জারি করল ভারতীয় রেল। পূর্ব রেল থেকে পাওয়া গেছে সেফটি বিভাগেও ১,৮৭৫ জন কর্মী কমানোর নিদান; পাশাপাশি এই বিভাগের সব পদে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিয়োগ বন্ধ রাখার কথাও জানানো হয়েছে। অর্থাৎ যে ভারতীয় রেলকে বলা হয় ভারতের লাইফলাইন, তা শুধু বৃহৎ পুঁজির কর্পোরেট কোম্পানির হাতে হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে না — তাদের জন্য কর্মী-সংকোচন করে দায়ভার এড়ানোর ব্যবস্থাও করে দেওয়া হচ্ছে। দেশে ৪৫ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেকারত্বের সময় ভোটবাক্সের জন্য বছরে দুই কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, ক্ষীণ করে দেওয়া হল ভবিষ্যতের শিক্ষিত নবীন প্রজন্মের চাকরির স্বপ্নকে। এরই সঙ্গে লাইফলাইনের সঙ্গে জড়িত দেশের বৃহত্তম অসংগঠিত ক্ষেত্রের কয়েক কোটি শ্রমিকের পরিবারের কর্মহীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে;

কর্পোরেট কোম্পানিগুলির মুখাপেক্ষী হয়েই কেটে যাবে তাঁদের ভবিষ্যৎ। রেল থেকে বিএসএনএল — প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় একই ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। যেমন, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়ামের কর্মীদের জন্য চালু হল স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প; কর্তৃপক্ষের শর্ত অনুসারে সংস্থার প্রায় ৬০ শতাংশ কর্মী এই ব্যবস্থার আওতায় আসবেন। এরপর এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় নিজেদের ৫৩.৩ শতাংশ অংশীদারিত্বের পুরোটাই বেচে দিতে চাইছে সরকার।[20] ভারতের তেলের বাজার বহুজাতিক সংস্থাগুলির জন্য খুলে দিতে বদ্ধপরিকর মোদি সরকার। সরকার বেপরোয়াভাবে বলেই দিয়েছে — বেসরকারিকরণ হবেই, না পোষালে বেরিয়ে যান সংস্থা থেকে। কর্পোরেট কোম্পানিগুলির কাছে এ যেন অমোঘ বাণী।

[20] সম্পাদকীয় টীকা: BPCL-এ সরকারের সম্পূর্ণ অংশীদারি (বিভিন্ন প্রতিবেদনে ৫২.৯৮%-৫৩.২৯%) বিক্রির পরিকল্পনা এবং প্রায় ৬০% কর্মীর জন্য স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প — দুই-ই সমকালীন প্রতিবেদনে নিশ্চিত। পাঠকের জ্ঞাতার্থে: উপযুক্ত দরদাতার অভাবে কেন্দ্র ২০২২ সালের মাঝামাঝি এই বিক্রয়-প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়।

শ্রমের দাম ভুলিয়ে দেবে

ভারতে কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য যখন গোটা দেশজুড়ে লকডাউন চলছে, তারই মধ্যে একের পর এক বিজেপি-শাসিত রাজ্য শিল্পমালিকদের স্বার্থে অর্ডিন্যান্স এনে শ্রম আইনে ব্যাপক পরিবর্তন করছে — উত্তরপ্রদেশে তো তিন বছরের জন্য মুলতুবি প্রায় সব শ্রম আইনই।[21] ফলে সেখানে ইচ্ছেমতো শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে; এমনকি 'মিনিমাম ওয়েজেস' — ন্যূনতম পারিশ্রমিক — দিতেও মালিকরা বাধ্য থাকবেন না। শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে, দিতে হবে না ওভারটাইমও। করোনা-পরবর্তী দিনে শ্রম আইনের পাকাপাকি পরিবর্তনই চাইছে সরকার — মহামারির পরে ভারতকে 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব' বা উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে নাকি এই

---

[21] সম্পাদকীয় টীকা: উত্তরপ্রদেশ সরকার ২০২০ সালের মে মাসে 'Uttar Pradesh Temporary Exemption from Certain Labour Laws Ordinance, 2020' জারি করে হাতে-গোনা কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে তিন বছরের জন্য প্রায় সব শ্রম আইন স্থগিত করে; মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যও একই সময়ে শ্রম আইন শিথিল করে। ILO-ও ওই মে মাসেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানায়, ভারতের অনুসমর্থিত ILO কনভেনশনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই শ্রম আইনের যে-কোনও পরিবর্তন করতে হবে। দুটি তথ্যই যাচাইয়ে নিশ্চিত।

ধরনের ‘সংস্কার’ জরুরি। অথচ রাতারাতি ভারতকে কখনওই চীনের মতো ম্যানুফ্যাকচারিং হাবে পরিণত করা সম্ভব নয়, আর সে চেষ্টা করতে গেলে তার মূল্য চোকাতে হবে দেশের গরিব মজদুরদেরই। দেশের প্রায় সমস্ত শ্রমিক সংগঠনই শ্রম আইনকে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের কাছে এভাবে বিক্রি করে দেওয়ার প্রতিবাদ করছে; উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনও (ILO)। কর্পোরেট বন্ধুদের দেনাপাওনার হিসাব চোকাতে হচ্ছে দেশের আপামর কোটি কোটি দেশবাসীকে। লকডাউনের আগে বেসরকারি কোম্পানিগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার কারও বেতন কাটতে বারণ করেছিল; অথচ ব্যাপক হারে ছাঁটাই ও বেতন-কাটা শুরু হলে সেই কেন্দ্রীয় সরকারই সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে বলে — লকডাউনে কেউ কাজ না করলে কোম্পানিগুলি বেতন দিতে বাধ্য নয়! পিএম কেয়ারে কোটি কোটি টাকা দেওয়া কোম্পানিগুলি অনায়াসে তাদের কর্মীদের ছাঁটাই এবং বেতন বন্ধ করে চলেছে।

দেশের সম্পদ বিক্রির টাকা যাচ্ছে কোথায়

২০১৪ সাল থেকে বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে কোষাগারে আসা টাকার পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার থেকেও বেশি; শেষ পাঁচ বছরে সম্পন্ন হয়েছে ২,৭৯,৬২২ কোটি টাকার বিলগ্নিকরণ।[22]

অন্যদিকে ৭৬ হাজার ৬০০ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ মকুব করে দিল স্টেট ব্যাংক — এই বিপুল পরিমাণ টাকা আর ফেরত পাওয়া যাবে না। মাত্র ৩৩ জন শিল্পপতি গ্রাহকের কাছ থেকেই ৩৭ হাজার ৭০০ কোটি টাকা আর আদায় করা যাবে না বলে ঘোষণা করেছে স্টেট ব্যাংক; তথ্য জানার অধিকার আইনে এই তথ্য দিয়েছে খোদ রিজার্ভ ব্যাংক। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি থেকে এইভাবে

---

[22] সম্পাদকীয় টীকা: ২,৭৯,৬২২ কোটি টাকার এই সংখ্যাটি সরকারি DIPAM/PRS Legislative Research-এর তথ্যের সঙ্গে হুবহু মেলে না — তুলনীয় পাঁচ-ছয় বছরের হিসাবে প্রকৃত বিলগ্নিকরণ-প্রাপ্তি প্রায় ৩.৩ থেকে ৩.৭ লক্ষ কোটি টাকা (যেমন ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৯-২০: ৩,৭২,৬৮৮ কোটি)। আর “লক্ষ্যমাত্রার থেকেও বেশি” কথাটি আংশিক সত্য: অর্থ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী এই পর্বের মাত্র দুটি অর্থবর্ষে (২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯) লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রান্ত হয়েছিল; ২০১৯-২০ সালে প্রাপ্তি ছিল লক্ষ্যের অর্ধেকেরও কম।

মকুব করা হয়েছে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। রিজার্ভ ব্যাংকের সেন্ট্রাল বোর্ড ১,৭৬,০৫১ কোটি টাকা সরকারকে দেওয়ার ব্যাপারেও সম্মতি দিয়েছে।[23] এরই মধ্যে শিল্পপতিদের কর্পোরেট করে দেওয়া হল ১০ শতাংশ ছাড় — যার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কর্পোরেট শিল্পপতিদের কর ছাড় দিয়েছে প্রায় ৬ লক্ষ কোটি টাকার। এই চক্রব্যূহের ফাঁদের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে দেশের আপামর জনগণের শ্রম এবং দেশের সম্পদ, আর সেই টাকায় কর্পোরেট কোম্পানিগুলিকে ঋণ দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলা হচ্ছে। তারই মধ্যে সম্পদের পাহাড় তৈরি করে নিচ্ছে বিশেষ সুবিধালোভী শিল্পপতিদের দল, আর সাধারণ

---

[23] সম্পাদকীয় টীকা: এই অনুচ্ছেদের দুটি প্রধান তথ্যই যাচাইয়ে নিশ্চিত। তথ্যের অধিকার আইনে প্রাপ্ত RBI-র তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত স্টেট ব্যাংক ১০০ কোটির বেশি ঋণখেলাপি ২২০ জনের ৭৬,৬০০ কোটি টাকা অবলোপন (write-off) করেছিল, যার মধ্যে ৫০০ কোটি বা তদূর্ধ্ব ঋণের ৩৩ জন গ্রাহকের ৩৭,৭০০ কোটি টাকা “অনাদায়যোগ্য” ঘোষিত হয়। আর ২০১৯ সালের ২৬শে আগস্ট বিমল জালান কমিটির সুপারিশ মেনে RBI-র সেন্ট্রাল বোর্ড সরকারকে রেকর্ড ১,৭৬,০৫১ কোটি টাকা হস্তান্তরে সম্মতি দেয়।

জনগণ থেকে যাচ্ছেন আকাশছোঁয়া বৈষম্যের শিকার হয়ে। জনসাধারণের রক্ত-জল-করা টাকাতেই ক্ষমতার অলিন্দে আজ মুষ্টিমেয় বণিকরা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

১৩০ কোটির মানবসম্পদ নিয়ে বিশ্বে সুপার পাওয়ার হতে চাওয়া ভারতের অবস্থান ২০১৯ সালের জাতিসংঘের (UNDP) মানব উন্নয়ন সূচকে ১৮৯টি দেশের মধ্যে ১২৯তম; প্রতিবেশী বাংলাদেশ ১৩৫তম এবং ভুটান ১৩৪তম।[24] দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয়ের মতো বিষয়ের উপর নির্ভর করে নির্ণয় করা হয় এই মানব উন্নয়ন সূচক। সার্বিকভাবে বৈষম্য, বঞ্চনা এবং দুর্নীতিতে আবিষ্ট দেশের এই মান নিয়ে অবশ্য মাথাব্যথা নেই দেশের শাসকদের।

দেশের সাম্প্রতিক প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে “মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক” অনায়াসে শুধুই “শিক্ষা মন্ত্রক”-এ রূপান্তরিত হলেও উন্নতি কতটা হবে, তা এখনই বলা অসম্ভব। তবে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংবিধান যখন শিক্ষাকে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ তালিকায় রেখেছে, তখন একতরফা নতুন নীতির

---

[24] সম্পাদকীয় টীকা: UNDP-র Human Development Report 2019 (ডিসেম্বর ২০১৯-এ প্রকাশিত, ২০১৮-র তথ্যভিত্তিক) অনুযায়ী ১৮৯টি দেশের মধ্যে ভারত ১২৯তম, ভুটান ১৩৪তম, বাংলাদেশ ১৩৫তম — তিনটি সংখ্যাই যাচাইয়ে হুবহু নিশ্চিত।

ঘোষণা আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের দম্ভেরই প্রতিফলন। নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক চলছে; অনেকেই একে বলছেন স্বৈরাচারী হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্তান তৈরির "মগজধোলাই"-এর ব্যবস্থা। মহান ভারতের আদর্শ — "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান" — কেন্দ্রীয় এই শিক্ষানীতির পরিপন্থী; এ যেন স্থানীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংসেরই চেষ্টা। বিদেশি শিক্ষার কপি-পেস্ট এ-দেশে চালু করতে গেলে যে ব্যাপক পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দরকার, সেখানেই ফাঁস হয়ে যায় পরিকল্পনা। সর্বত্র বেসরকারিকরণের স্বপ্ন দেখা সরকার শিক্ষাকেও ছেড়ে দিতে চায় কর্পোরেট কোম্পানিগুলির কাছে। টাকার বিনিময়ে বেসরকারি শিক্ষা-সংস্থার নিয়ন্ত্রণ দেশের শহরগুলিকে আগেই গিলে নিয়েছে; নতুন শিক্ষানীতি তাদের করে তুলবে সর্বগ্রাসী। ভবিষ্যৎ ভারতে টাকা ছাড়া উন্নত শিক্ষা অধরাই থেকে যাবে।

করোনা পরিস্থিতিতে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল অবস্থা

ভারত প্রতিদিন করোনায় সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড করে চলেছে। এই অবস্থায় দেশের ভঙ্গুর স্বাস্থ্যব্যবস্থা পড়েছে এক বিশাল সংকটে। হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার মতো অবস্থা নেই; অনেক রোগী পাঁচ-ছয়টি হাসপাতাল ঘুরে শেষে মারা যাচ্ছেন হাসপাতালের দরজায়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিকাঠামো নেই। ভারতের অধিকাংশ মানুষ এমনিতেই এসব জানতেন; এ-ও

জানতেন যে বেসরকারি হাসপাতালগুলি ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। মৃতপ্রায় রোগীকে ভেন্টিলেটরে ফেলে রেখে বিল বাড়ানো হয়েছে — এই অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনের; অথচ প্রয়োজনের সময় সেই ভেন্টিলেটরই পাওয়া যাচ্ছে না। তার সঙ্গে অনিয়ম। গুজরাটের সরকারি হাসপাতাল কয়েক কোটি টাকা দিয়ে একটি সরকার-ঘনিষ্ঠ সংস্থার কাছ থেকে ভেন্টিলেটর কিনেছে — কিন্তু সেই ভেন্টিলেটরগুলি আসলে কাজই করে না; অথচ পিএম কেয়ার্স ফান্ড থেকে টাকা নিয়ে সেই ভেন্টিলেটর কেনা হয়েছে। সারা বছরই স্বাস্থ্যখাতে এমন নানা অনিয়মের কথা শোনা যায়; করোনা সেই সবকিছুকেই একেবারে সামনে নিয়ে এসেছে — কিছুই আর লুকোনো নেই। দেশের অধিকাংশ মানুষ নির্ভরশীল শুধু সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপরই। সরকার যখন স্বাস্থ্যখাতে কম বাজেট বরাদ্দ করে, তখন চিকিৎসা নিতে গিয়ে বেড়ে যায় মানুষের নিজের পকেটের খরচ। একটি হিসাব বলছে, স্বাস্থ্যখাতে নাগরিকরা তাঁদের পকেট থেকে শতকরা ৯০ ভাগ টাকা খরচ করতে বাধ্য হন।[25] করোনাকালে বোঝা

[25] সম্পাদকীয় টীকা: ভারতের National Health Accounts-এর তথ্য অনুযায়ী এই সময়পর্বে দেশের মোট স্বাস্থ্যব্যয়ের মধ্যে নাগরিকের নিজের পকেটের খরচের (Out-of-Pocket Expenditure) অংশ ছিল আনুমানিক ৫৫-৬৫ শতাংশ (যেমন NHA ২০১৬-১৭: প্রায় ৫৮.৭%) — ৯০ শতাংশ নয়। এই হার অবশ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে তখনও অত্যন্ত উঁচু ছিল; মূল প্রবন্ধের সংখ্যাটি

গেল, গোটা ভারতের স্বাস্থ্য-পরিকাঠামোর অবস্থা উপর থেকে চকচকে, ভিতরটা ফাঁপা। অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত আইসিইউ বেড নেই, নেই ভেন্টিলেটর। অগত্যা ব্যাংকোয়েট হল, স্টেডিয়ামে বিকল্প হাসপাতাল তৈরির কথা ভাবছে সরকার। কেন সরকার এমনটা আগে ভাবেনি?

আমরা জানি, এ-দেশে এমনও শিল্পপ্রতিষ্ঠান আছে, যারা চাইলে দেশের স্বাস্থ্যখাতকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। চিকিৎসা করাতে গিয়ে একজন দরিদ্র মানুষকে যে টাকাটা পকেট থেকে হাসপাতালে খরচ করতে হয়, এইসব শিল্পপ্রতিষ্ঠান অনুদানের মাধ্যমে খুব সহজেই সেই খরচ বহন করতে পারে। বিত্তবানরা চাইলে এক্ষুনি সাজিয়ে দিতে পারেন সরকারি হাসপাতালগুলির আইসিইউ ইউনিট; দিয়ে দিতে পারেন ট্রলি, বেড, হুইলচেয়ার, টেস্ট কিট, ওষুধ, ভেন্টিলেটর, পিপিই-সহ অনেক কিছুই। বড় বড় শিল্পপতিরা ব্যবসার জন্য যেমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, তেমনি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এমন হাসপাতাল গড়ে তুলবেন না কেন — যেখানে সাধারণ গরিব ভারতীয়রাও বিনা টাকায় পাবেন সর্বাধিক চিকিৎসা? কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির (সিএসআর) তহবিল থেকে কেন নেওয়া হবে না এই উদ্যোগ? বড় বড়

অপরিবর্তিত রেখে যাচাইকৃত পরিসরটি এখানে উল্লেখ করা হল।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোনও উৎপাদনই তো কাজে আসবে না, যদি দেশের বিত্তবানদের সঙ্গে সাধারণ মানুষগুলিও সঠিক চিকিৎসার সুবিধা না পান।

স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে ১৮৮টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১৭০ — একেবারে নিচের দিকে।[26] সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলির অন্যতম হয়েও ভারতের বরাদ্দ জিডিপি-র মাত্র ১.৬%; সেখানে কম জনবহুল দেশ আমেরিকার বরাদ্দ জিডিপি-র ১৬.৯%, জার্মানি ও ফ্রান্সে বরাদ্দ ১১ শতাংশেরও বেশি। বেসরকারি হাসপাতালের খরচের হিসাব ধরলে ভারতের সর্বমোট স্বাস্থ্যখাতে খরচ জিডিপি-র ৩.৬%, আর সরকারি বাজেট বরাদ্দ জিডিপি-র সেই ১.৬%-ই। এই যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে তা সামান্য বাড়িয়ে ৩.৬% বা তার বেশি কেন করা হবে না — যে বরাদ্দের মূল লক্ষ্য হবে দেশের

---

[26] সম্পাদকীয় টীকা: “১৮৮টি দেশের মধ্যে ১৭০তম” — এই নির্দিষ্ট ক্রমটি কোনও একক প্রাথমিক সূত্রে খুঁজে পাওয়া যায়নি; মূল প্রকাশনার হিসাবেই রাখা হল। মূল বক্তব্যটি অবশ্য সুপ্রতিষ্ঠিত: স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়ের অনুপাতে ভারত ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের একেবারে নিচের সারিতে (WHO/World Bank-এর তথ্যে জিডিপি-র ১-১.৬%), এবং Lancet-এর Healthcare Access and Quality সূচকে (২০১৮) ১৯৫টি দেশের মধ্যে ভারত ছিল ১৪৫তম।

মানুষকে বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে সর্বাধুনিক চিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া? করোনা-পূর্ববর্তী সরকারি রিপোর্টেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে — স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ জিডিপি-র ২.৫% না করলে এবং ২০২৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা অনুযায়ী পরিষেবা-ব্যবস্থার উন্নতি না করলে দেশে বড় বিপর্যয় হতে পারে। সেই বিপর্যয় করোনাভাইরাস আগেই নিয়ে এসেছে। দেশের সাধারণ মানুষদের রক্ষায় সুপার পাওয়ারের স্বপ্ন দেখা ভারত সরকার কি অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে আসবে? নাকি রয়ে যাবে কর্পোরেট কোম্পানিগুলিই এই সংকট থেকে পার করে দেবে — এই আশায়?

‘ফেলো কড়ি মাখো তেল’ — বেসরকারি সংস্থা মহান

বেসরকারিকরণ হলে দেশের ভালো — কাজ না করে বেতন পাওয়া বন্ধ হবে, ভালো পরিষেবা পাওয়া যাবে, হয়রানি নেই, লাল ফিতের ফাঁস নেই, আধুনিক ব্যবস্থা, সর্বোপরি ঘুষ (দুর্নীতি) নেই — চারপাশের বেশির ভাগ মানুষের মুখে আমরা সবাই এই একই কথা শুনতে পাই। তাঁরা “ফেলো কড়ি, মাখো তেল”-এই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। অথচ দেশের সপ্তম বেতন কমিশনের (২০১৬) রিপোর্ট অনুযায়ী, আমাদের দেশে প্রতি ১,০০০ জনে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত মাত্র ১৬ জন মানুষ, তার মধ্যে ৩৪.৭% আবার চুক্তিভিত্তিক ও ঠিকা কর্মী; যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যা ৭৭, নরওয়েতে ১৫৯, সুইডেনে ১৩৮,

ফ্রান্সে ১১৪ — এবং এই দেশগুলিই পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ও দুর্নীতিমুক্ত দেশগুলির অন্যতম।[27] তাই সরকারি কাজ মানেই দুর্নীতির লাইসেন্স এবং তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর — এমনটা বলা যায় না। আসলে আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে দায়ী করার চেয়ে ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সোজা; আর সেই সুযোগে বেসরকারি সংস্থা থেকে টাকার বিনিময়ে সহজে পরিষেবা পাওয়ার প্রচারে দেশের নিরন্ন প্রান্তিক মানুষের মুখেও সেই এক বুলি। কিন্তু বেসরকারি সংস্থার হাতে দেওয়া বাড়তি টাকার সঙ্গে ঘুষখোর সরকারি কর্মীর কোনও সম্পর্ক না থাকলেও, সরকারি নজরদারি ও ম্যানেজমেন্টের দূরদর্শিতার অভাব অবশ্যই আছে — আর এই দুটোই নির্ভর করে দেশের সরকারের উপর। বেসরকারি সংস্থা আপনাকে পরিষেবা দেবে, কিন্তু মূল্য দিতে হবে আগেই। মাঝেমধ্যেই শোনা যায়, টাকা মেটানো হয়নি

[27] সম্পাদকীয় টীকা: প্রতি হাজারে সরকারি কর্মীর এই আন্তর্জাতিক তুলনামূলক সংখ্যাগুলি (ভারত ১৬, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৭৭, নরওয়ে ১৫৯ প্রভৃতি) ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে বহুল-প্রচলিত হলেও সপ্তম বেতন কমিশনের মূল প্রতিবেদনে হুবহু এই আকারে খুঁজে পাওয়া যায়নি; মূল প্রকাশনায় যেমন ছিল, তেমনই রাখা হল। সাধারণ চিত্রটি অবশ্য স্বাধীন আন্তর্জাতিক তথ্যের (OECD প্রভৃতি) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ — জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতের সরকারি কর্মিসংখ্যা উন্নত দেশগুলির তুলনায় লক্ষণীয়ভাবে কম।

বলে বেসরকারি হাসপাতাল আটকে রেখেছে মৃতদেহ; নামমাত্র চিকিৎসায় লাখ লাখ টাকার বিল তো নিত্যদিনের ঘটনা — বিশ্বজোড়া স্বাস্থ্য-বিপর্যয়ের সময়েও যা করতে পিছপা হয় না বেসরকারি হাসপাতাল-সংস্থাগুলি। শিক্ষাতেও সেই একই ছবি: বেসরকারি আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্র পাওয়ার একমাত্র মাপকাঠি টাকাই। এই লকডাউনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিষেবা বন্ধ থাকার পরেও স্কুলের বিল মেটাতে হবেই; অভিভাবকদের শত বিক্ষোভের পরও স্কুলে থাকতে গেলে বিল মিটিয়েই ঢুকতে হবে — এর পরেও বেসরকারিকরণ ভালো! লকডাউনে বেসরকারি বিদ্যুতের অযৌক্তিক ও লাগামহীন বিল মেটানোর পর সার্বিক ক্ষোভের পরও বেসরকারিকরণ ভালো! সামান্য সরকারি গ্রুপ ডি-র পরীক্ষায় জীবন বাজি রেখে ৫০ লক্ষ কর্মপ্রার্থীর রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাতায়াতের পরও বলা হয় — সরকারি চাকরিই তুলে দেওয়া দরকার! সরকারি ডোমের পদের জন্য পিএইচডি-করা শিক্ষিত যুবকদের আবেদনের দেশে বলা হয় — সরকারি ব্যবস্থাই বন্ধ করে দেওয়া দরকার! দেশের ৯০% মানুষের একমাত্র সম্বল বিনামূল্যের সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র এখুনি তুলে দিতে হবে বেসরকারি সংস্থার হাতে! অথচ দেশের ৭০% মানুষের — যার মধ্যে ২৭% দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী, নুন আনতে পান্তা ফুরানোর দশা যাঁদের — একমাত্র সম্বল বিনামূল্যের সরকারি পরিষেবাই। আপনার গা-ঘিনঘিন-করা সরকারি পরিষেবা

ভালো না-ই লাগতে পারে; তার মানে এই নয় যে কারোরই এই পরিষেবা দরকার নেই। দেশের সরকারি সম্পত্তি ও ব্যবস্থাকে লঘু বা খারাপ করে দেখালে বেসরকারিকরণ খুবই সহজ হয়ে যায়, আর এই মিথ্যার জালে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন অনেকেই। এই প্রসঙ্গে বলি — দেশের প্রত্যন্ত গ্রামেও যোগাযোগের একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত দূরভাষ সংস্থা বিএসএনএলকে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার বহু চেষ্টা করেও সামাজিক বিক্ষোভের জেরে তা সম্ভব হয়নি; তখন চলছে কর্মীদের দীর্ঘদিন বেতন বন্ধ রাখা আর জোরপূর্বক স্বেচ্ছাবসরের চেষ্টা। এরই সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয় বিএসএনএলের আধুনিকীকরণ — দীর্ঘদিন ধরে ৪জি স্পেকট্রাম চাইলেও সরকার তা দেয়নি। কাদের স্বার্থে? রাষ্ট্রায়ত্ত এসবিআই ব্যাংকের পরিষেবা নিয়েও এক সময় গ্রাহকদের চরম অভিযোগ ছিল; কিন্তু আধুনিক পরিকাঠামো ও ম্যানেজমেন্টের দূরদর্শিতায় তা আজ শুধু দেশে নয়, এশিয়ার অন্যতম ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান। প্রায় সব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ক্ষেত্রেই কমবেশি এ-কথা বলা যায়; কিন্তু তবু বিক্রি করে দেওয়া হবে লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকেই। কাদের স্বার্থে দেশের জনগণের শেষ সম্বল — গচ্ছিত টাকা — রাখার একমাত্র জায়গা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকে দেওয়া হচ্ছে বেসরকারি সংস্থার হাতে, আর সেই সম্পদ কতটা সুরক্ষিত থাকবে? করোনা মোকাবিলায় দেশের একমাত্র ভরসা কিন্তু সেই সরকারি ব্যবস্থাই!

প্রতিবাদ যখন ফলপ্রসূ

করোনাভাইরাসে প্রাথমিকভাবে কিছুটা কাজে দিচ্ছে হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন ওষুধটি।[28] প্রথম জানাজানি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুমকির কাছে আমাদের আত্মনির্ভরশীল প্রধানসেবকের দম্ভ আত্মসমর্পণ করে। এই হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন উৎপাদনের বরাত ভারতে দেওয়া হল দুটি বেসরকারি কোম্পানিকে; অথচ ১২৭ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত দেশের অন্যতম ওষুধ-নির্মাতা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল’ ওষুধটির ব্যাপক উৎপাদনে সক্ষম হয়েও বরাত পায়নি।[29] সোশ্যাল মিডিয়ায়

---

[28] সম্পাদকীয় টীকা: মূল প্রকাশনায় ওষুধটির নাম ছাপা হয়েছিল “হাইড্রোলিক ক্লোরোকুইন” — মুদ্রণপ্রমাদ; সঠিক নাম হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন (hydroxychloroquine), বর্তমান সংস্করণে তা সংশোধিত হল। ভারতের রপ্তানি-নিষেধাজ্ঞা এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের চাপে তার প্রত্যাহার (এপ্রিল ২০২০) — দুটি ঘটনাই যাচাইয়ে নিশ্চিত (সূত্র: NPR, Al Jazeera, April 2020)।

[29] সম্পাদকীয় টীকা: “১২৭ বছরের ঐতিহ্য” হিসাবটি মেলে কেবল ১৮৯২ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অনানুষ্ঠানিকভাবে ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল

ব্যাপক বিক্ষোভের জেরে শেষ পর্যন্ত বরাত মেলে। আর এই লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটিকেও একটি বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

বর্তমান ভারতে চলছে সেই বণিক-শিল্পপতি কর্পোরেট শ্রেণিরই একচ্ছত্র ক্ষমতা দখলের লড়াই। সঙ্গত পেয়ে যাচ্ছে তারা সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের রক্ষাকারী জনপ্রতিনিধিদের — যাঁরা সাংবিধানিক দায়িত্ব হিসেবে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করার বদলে তিলতিল করে গড়ে তোলা দেশের সম্পদ বেচে দিয়ে যাচ্ছেন ওই মুষ্টিমেয় কর্পোরেটদের কাছেই। শেষ কথা কিন্তু বলবে দেশের সেই ৭০% দরিদ্র মানুষই, যাঁদের কাছে বেসরকারি ব্যবস্থা আকাশকুসুম স্বপ্ন। বেসরকারি সর্বস্বতা দেশের অধিকাংশ মানুষের শুধু জীবন-জীবিকাকেই বিপন্নতায় আটকে রাখবে না, ধীরে ধীরে হরণ করবে দেশের স্বাধীনতাকেও — যেভাবে

ওয়ার্কস'-এর কাজ শুরুর সময় থেকে গণনা করলে (২০২০ সালে প্রায় ১২৮ বছর); সংস্থাটির আনুষ্ঠানিক নিবন্ধন ১৯০১ সালে — সেই হিসাবে ২০২০ সালে বয়স দাঁড়ায় ১১৯ বছর। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার পর ২০২০ সালের ১১ই এপ্রিল নাগাদ সংস্থাটির হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন উৎপাদনের ছাড়পত্র পাওয়ার ঘটনাক্রমটি যাচাইয়ে নিশ্চিত।

২০০ বছর আগে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির "বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী, দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে"!

[তথ্যসূত্র: বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ]

অধ্যায় ৪ — মূর্তি ভাঙা: মতাদর্শের লড়াই?

ভারতে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী সংগ্রামের বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন পাঞ্জাবের ভগৎ সিং; ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[30] মৃত্যুর আগে তিনি করেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, যা আজও বিশেষভাবে সমাদৃত— "ব্যক্তিকে সহজেই হত্যা করা যায়, কিন্তু আদর্শকে হত্যা করা যায় না। বড় বড় সাম্রাজ্য ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু আদর্শ টিকে থেকেছে ঠিকই।"

মৃত্যুর আগে কিউবা বিপ্লবের প্রধান ব্যক্তিত্ব চে গুয়েভারা বলিভিয়ার সৈন্যদের উদ্দেশে বলেছিলেন— "I know you have come to kill me. Shoot, coward. You are only going to kill a man."[31]

---

[30] সম্পাদকীয় টীকা: ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের ফাঁসি লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় কার্যকর হয়— তারিখটি যাচাইকৃত। উদ্ধৃত বক্তব্যটি প্রামাণ্য, তবে তা মৃত্যুর ঠিক আগের উক্তি নয়; ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় আইনসভায় বোমা নিক্ষেপের সময় বিলি করা প্রচারপত্রে কথাগুলি লেখা ছিল।

ধ্বংস যখন ধ্বংসাত্মক

বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় বুদ্ধমূর্তিগুলির অন্যতম। ২০০১ সালের মার্চ মাসে তালিবানের হাতে ধ্বংস হয় মধ্য আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশের ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত, প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরনো ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তি দুটি। ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে দশম শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে যে বিশেষ ধরনের শিল্পকলা বিকাশ লাভ করেছিল, মূর্তি দুটি ছিল সেই গান্ধার শিল্পেরই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তালিবান নেতা মোল্লা মুহম্মদ ওমরের নির্দেশে, ইসলামের দোহাই দিয়ে, ২০০১ সালের মার্চ মাসে পাহাড়ের গায়ে ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বড় মূর্তি দুটিকে ধ্বংস করা হয়; পরে ২০০৩ সালে ইউনেস্কো বামিয়ান উপত্যকাকে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করে।[32] গোটা বিশ্ব জুড়ে নিন্দার ঝড় উঠল। কিন্তু আঞ্চলিক সন্ত্রাসী কাজ কি আর থেমে থাকবে!

---

[31] সম্পাদকীয় টীকা: চে গুয়েভারার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ১৯৬৭ সালের ৯ অক্টোবর, বলিভিয়ার লা ইগুয়েরা গ্রামে। উদ্ধৃত ’শেষ কথা’টি বহুল প্রচারিত হলেও এর কোনো নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক নথি নেই; ঐতিহাসিক পর্যালোচনাগুলির অনেকেই একে পরবর্তীকালে গড়ে ওঠা কিংবদন্তিমূলক ভাষ্য বলে গণ্য করে।

সম্বিৎ ফিরে পেতে দেরি হল না। স্রষ্টাকে যে সৃষ্টির ফল ভোগ করতে হবে, কে জানত?

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সকালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর আল কায়েদার (তালিবান-আশ্রিত লাদেন বাহিনী) একইসঙ্গে চারটি সমন্বিত সন্ত্রাসী হামলা ঘটে— ইংরেজিতে যা 9/11 নামেও পরিচিত। আক্রমণে ২,৯৭৭ জন নিহত[33] এবং ৬,০০০-এর অধিক মানুষ আহত হন, আর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অবকাঠামো ও সম্পদ।

---

[32] সম্পাদকীয় টীকা: মূল রচনায় ইঙ্গিত ছিল, ধ্বংসের আগেই ইউনেস্কো মূর্তিগুলিকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ইউনেস্কো ‘বামিয়ান উপত্যকার সাংস্কৃতিক নিসর্গ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ’-কে বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র হিসেবে তালিকাভুক্ত করে ২০০১ সালের ধ্বংসকাণ্ডের দুই বছর পরে, ২০০৩ সালে; একই সঙ্গে ক্ষেত্রটি ‘বিপন্ন বিশ্ব ঐতিহ্য’ তালিকাতেও ওঠে। বর্তমান সংস্করণে বাক্যটি সেই অনুযায়ী সংশোধিত।

[33] সম্পাদকীয় টীকা: মূল রচনায় নিহতের সংখ্যা ২,৯৯৭ ছাপা হয়েছিল; সরকারি ও সর্বাধিক স্বীকৃত হিসাবটি ২,৯৭৭ (১৯ জন ছিনতাইকারীকে বাদ দিয়ে)। অঙ্ক-বিপর্যয়জনিত মুদ্রণপ্রমাদটি বর্তমান সংস্করণে সংশোধন করা হয়েছে।

এই রকম উদাহরণ ইতিহাসে ইতিউতি ছড়িয়ে আছে।

বর্তমানে ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনে জিতে বিজেপি সরকার গঠনের দাবিদার হয়ে উঠতেই, পূর্ববর্তী সরকারের আদর্শগত নেতা লেনিনের মূর্তি ভাঙা হল![34] এই কাণ্ডে বহু বিজেপি নেতার আস্ফালন দেখা গেল। রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপালও সংবিধানবিরোধী বক্তব্য রাখলেন এবং মনে করিয়ে দিলেন তাঁর পূর্ববর্তী রাজনৈতিক পরিচয়।

মনে করিয়ে দিলেন পুরনো ইতিহাস।

বাবরি মসজিদ— ভারতের উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যা শহরে, রামকোট পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। ১৯৯২ সালে একটি রাজনৈতিক সমাবেশের উদ্যোক্তারা, ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত

---

[34] সম্পাদকীয় টীকা: ২০১৮ সালের ৩ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার অব্যবহিত পরে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় (৫ মার্চ ২০১৮) বুলডোজার দিয়ে লেনিনের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়; সাব্রুমেও আর একটি মূর্তি ভাঙা পড়ে। তৎকালীন রাজ্যপাল তথাগত রায়— ২০০২–২০০৬ সালে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি— মূর্তি ভাঙা নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ান; রাজ্যপাল-পদের সাংবিধানিক দায়িত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর বিরুদ্ধে স্মারকলিপিও জমা পড়ে।

হবে না— এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মসজিদ-সংলগ্ন এলাকায় সমাবেশ শুরু করে; প্রায় ১,৫০,০০০ মানুষের সেই জমায়েত দাঙ্গার রূপ নেয় এবং মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ করা হয়। ফলস্বরূপ ওই একই বছরে ভারতের প্রধান শহরগুলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যা মুম্বই, দিল্লি-সহ বিভিন্ন শহরে প্রায় ২,০০০ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।[35] মুসলিম রাজত্বের বহু বিখ্যাত ভাস্কর্য বা স্থাপত্যকে হিন্দুত্ববাদীরা চিহ্নিত করেছে এবং সেগুলি কাল্পনিক হিন্দু মন্দির ছিল বলে দাবি রাখছে! দেশের ভিতরে ভয়ে-ভক্তির বাতাবরণ তৈরিতে এরা ব্যস্ত।

লড়াই ছড়াচ্ছে

ত্রিপুরায় লেনিন-মূর্তি ভাঙার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা দেশ জুড়ে এল বিজেপির মতাদর্শবিরোধী দেশবরেণ্য বিভিন্ন নেতার মূর্তি ভাঙার খবর।

---

[35] সম্পাদকীয় টীকা: বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয় ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর; সমাবেশে জমায়েত ছিল প্রায় দেড় লক্ষ। পরবর্তী দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা সূত্রভেদে ভিন্ন— দেশ জুড়ে বিভিন্ন শহর মিলিয়ে দুই সহস্রাধিক মৃত্যুর হিসাবই সর্বাধিক উদ্ধৃত; শুধু মুম্বই দাঙ্গাতেই শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের হিসাবে প্রায় ৯০০ জন নিহত হন।

উত্তরপ্রদেশে ভাঙা হল ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের মূর্তি— যিনি ভারতের সংবিধান-রচয়িতাদের একজন। আম্বেদকর সারাটা জীবন লড়ে গেছেন সামাজিক বৈষম্যের (Social Discrimination) বিরুদ্ধে, হিন্দু সমাজের "চতুর্বর্ণ পদ্ধতি"-র বিরুদ্ধে এবং ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতা-প্রথার (Untouchability) বিরুদ্ধে। ভারতে ক্ষমতাসীন দল বিজেপির এক নেতার ফেসবুকে দেওয়া হুমকির কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তামিলনাড়ুতে ভাঙচুর হয়েছে দ্রাবিড় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আইকন, 'পেরিয়ার' নামে পরিচিত সমাজকর্মী ই ভি রামাসামির মূর্তি। সমাজকর্মী পেরিয়ার ভারতে 'আত্মসম্মান আন্দোলন' এবং দ্রাবিড় ভাষাভাষীদের প্রথম সংগঠন দ্রাবিড়ার কাজাঘামের সূচনা করেছিলেন। হিন্দুত্ববাদীদের অন্যতম প্রধান আদর্শিক নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির একটি মূর্তি হাতুড়ি দিয়ে কিছুটা ভেঙে তার উপরে কালো কালি লাগিয়ে দিয়েছে কলকাতার কয়েকজন অতি-বামপন্থী ছাত্রছাত্রী; পুলিশ সেখান থেকে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই গ্রেপ্তার নিয়ে আন্দোলনকারীরা প্রশ্ন তুলেছেন— প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুধু তাঁদের বিরুদ্ধেই নেওয়া হচ্ছে, এবং শুধু এই রাজ্যেই! এরই মধ্যে পশ্চিম বর্ধমানে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মূর্তি বিকৃত

করার চেষ্টা হয়েছে![36] অনেকেই আশঙ্কার তালিকা শুনিয়েছেন— রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর থেকে নেতাজি, কাউকে নাকি বাদ দেবে না এরা!

তবে বিশ্লেষকদের মতে প্রশ্ন অন্য: মতাদর্শগত নেতাদের মূর্তি ভেঙে দেওয়ার পিছনে কি তাহলে বামপন্থী আর হিন্দুত্ববাদী— এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুর রাজনৈতিক আদর্শের লড়াই-ই কাজ করেছে?

জবাব দিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বিমলশঙ্কর নন্দ— "এতদিন বৌদ্ধিক পর্যায়ে সংঘাতটা ছিল বামপন্থী আর জাতীয়তাবাদী, অর্থাৎ আপনি যাঁদের হিন্দুত্ববাদী বলছেন, তাঁদের মধ্যে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরাই ইতিহাস ব্যাখ্যা করে

---

[36] সম্পাদকীয় টীকা: ২০১৮ সালের মার্চের এই ঘটনাপরম্পরা সমসাময়িক সংবাদসূত্রে যাচাইকৃত: উত্তরপ্রদেশের মিরাটে আম্বেদকর-মূর্তি ভাঙচুর (৬–৭ মার্চের রাতে); বিজেপির জাতীয় সম্পাদক এইচ. রাজার ফেসবুক-মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তামিলনাড়ুর তিরুপাত্তুরে পেরিয়ার-মূর্তি ভাঙচুর (৬ মার্চ); কলকাতার কালীঘাট-সংলগ্ন পার্কে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আবক্ষমূর্তিতে হাতুড়ির আঘাত ও কালি লেপন, সাতজন গ্রেপ্তার (১০ মার্চ); এবং পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোলে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মূর্তিতে রং লেপে বিকৃতি (৯–১০ মার্চের রাতে)— সূত্রগুলি এটিকে ভাঙার চেষ্টা নয়, রং/কালি দিয়ে বিকৃতি হিসেবেই বর্ণনা করেছে।

এসেছেন এতদিন। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার পর তাঁদের মতাদর্শের সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা ইতিহাস-সমাজ নতুন করে ব্যাখ্যা করছেন এখন। তাই এই সংঘাতটা ইন্টেলেকচুয়াল পর্যায়ে আছেই। তবে নতুন যেটা যোগ হয়েছে, তা হল ওই দুই মতাদর্শের লড়াই এখন তৃণমূল স্তরেও প্রকট হচ্ছে। এটা সম্ভবত তারই বহিঃপ্রকাশ।"

মূর্তি না ভাস্কর্য — লড়াই দুনিয়া জুড়ে

বাংলাদেশে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়েছিল দৃষ্টিনন্দন এক ভাস্কর্য— বাংলাদেশের আদালত প্রাঙ্গণে এই প্রথম কোনো ভাস্কর্য স্থাপিত হল। ভাস্কর্যটির স্থাপত্যশৈলী নান্দনিকতার এক অনন্য নিদর্শন; রোমানদের কাছে এই 'লেডি জাস্টিস' ন্যায়বিচারের প্রতিমূর্তি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সামনে 'গ্রিক দেবীর মূর্তি' স্থাপন করা হয়েছে— এমন দাবি তুলে এর অপসারণ চেয়ে আসছিল হেফাজতে ইসলাম-সহ ধর্মভিত্তিক নানা সংগঠন। ওদের বক্তব্য, ভাস্কর্যশিল্পের নামে ইসলামি সংস্কৃতির বিরোধিতা করা হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে অন্ধকার যুগের পৌত্তলিক সংস্কৃতিকে। শেষপর্যন্ত ভাস্কর্যটি সরিয়ে ফেলা হয়।[37]

---

[37] সম্পাদকীয় টীকা: বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণের 'লেডি জাস্টিস' ভাস্কর্যটি (স্থাপন: ডিসেম্বর ২০১৬) সরানো হয় ২০১৭ সালের ২৬ মে গভীর

প্রশ্নটা তখনই ওঠে— মূর্তি, না ভাস্কর্য?

ভাস্কর্য অর্থ Sculpture (স্কালপচার)। যে আকৃতি বা ছবি খোদাই করে তৈরি করা হয়, তা-ই ভাস্কর্য। যেমন বলা হয় 'ভাস্কর্যবিদ্যা'— এর অর্থ The art of carving বা খোদাই-বিদ্যা। যিনি এই বিদ্যা অর্জন করেছেন তাঁকে বলা হয় ভাস্কর (Sculptor), অর্থাৎ যিনি খোদাই করে আকৃতি বা ছবি নির্মাণ করেন। অক্সফোর্ড অভিধানে আছে— One who carves images or figures, অর্থাৎ যিনি ছবি অথবা আকৃতি খোদাই করে তৈরি করেন। পক্ষান্তরে মূর্তি অর্থ ছায়া, বা এমন আকৃতি-শরীর যার ছায়া আছে। মূর্তি অর্থ দেহ, শরীর, আকৃতি, চেহারা, রূপ। ভাস্কর অর্থ ধাতু-প্রস্তর প্রভৃতি দ্বারা মূর্তি-নির্মাণকারী, আর ভাস্কর্য অর্থ উক্তভাবে মূর্তি নির্মাণের শিল্প (সংসদ বাংলা অভিধান, পৃ. ৪৬৮, ৫০৩)। সুতরাং মূর্তি এবং ভাস্কর্য একই জিনিস; দুটির মধ্যে শাব্দিক পার্থক্য ছাড়া কোনো পার্থক্য নেই।

ইসলামে মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ; ইসলামে যে কোনো প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণই নিষিদ্ধ, তাই ভাস্কর্যও নিষিদ্ধ। আবার আমেরিকার বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তিপূজার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন বলে কথিত— "Hindus

---

রাতে; দু'দিন পরে সেটি আদালত চত্বরেরই অপেক্ষাকৃত অন্তরালবর্তী একটি স্থানে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল।

are not idol-worshipers. They are ideal-worshipers”[38]— অর্থাৎ হিন্দুরা মূর্তিপূজক নন, তাঁরা আদর্শের পূজারি। মূর্তি একটি আদর্শের প্রতীক মাত্র; হিন্দুরা কখনোই সেই মূর্তিকে ঈশ্বর বলেন না, প্রতিমা ঈশ্বরের প্রতীক মাত্র। কিন্তু বাস্তব অন্য কথা বলে!

শাসকের মূর্তি স্থাপন

বিভিন্ন সময়ে বিপুল অর্থ ব্যয় করে বহু বিতর্কিত কাজের জন্য গণমাধ্যমে খবর হয়েছেন ভারতের উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী। তবে এবার টাকার মালা পরে বা জুতো আনতে বিমান পাঠিয়ে নয়— তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প বাস্তবে রূপ দিতে ৬৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেছেন একটি পার্ক। এটির নাম ভীমরাও আম্বেদকর পার্ক। উত্তরপ্রদেশের নয়ডা এলাকায় ৩৩ হেক্টর জমির উপর পার্কটি গড়ে তোলা হয়েছে। মায়াবতীর ব্রোঞ্জের মূর্তির পাশাপাশি এখানে দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে বি আর আম্বেদকর, জ্যোতিরাও

---

[38] সম্পাদকীয় টীকা: এই ইংরেজি বাক্যটি স্বামী বিবেকানন্দের নামে বহুল প্রচারিত হলেও তাঁর ১৮৯৩ সালের শিকাগো বক্তৃতার প্রকাশিত পাঠে বা প্রামাণ্য রচনাবলিতে হুবহু এই বাক্যটি খুঁজে পাওয়া যায় না; মূর্তিপূজা প্রসঙ্গে তাঁর নথিভুক্ত বক্তব্য এই সংক্ষিপ্ত সূত্রটির চেয়ে সূক্ষ্মতর ও শর্তসাপেক্ষ। উদ্ধৃতিটি তাই ‘কথিত’ হিসেবেই পঠনীয়।

ফুলে ও কাঁশিরামের ১৫টি মূর্তি শোভা পাবে; অন্যান্য মূর্তির পাশাপাশি স্থাপিত হবে ২০টি হাতির মূর্তিও। সরকারি টাকায় এই অপচয় নিয়ে জনস্বার্থ মামলায় আদালত বলে— এমন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার দায় জনগণকেই নিতে হবে।

গুজরাটে সর্দার সরোবরের ধারে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৮২ মিটার দীর্ঘ মূর্তি বসানোর কাজ চলছে; একে জাতীয় প্রকল্পের তকমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। বিশ্বের দীর্ঘতম এই মূর্তি ভারতীয় সংহতি ও বিশালত্বের প্রতীক বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’-র নামাবলি-ধারণকারীর দেশের বদলে তা চিনে তৈরি করার কী দরকার ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।[39]

---

[39] সম্পাদকীয় টীকা: ‘স্ট্যাচু অব ইউনিটি’-র উচ্চতা ১৮২ মিটার— বিশ্বের উচ্চতম মূর্তি; সমগ্র প্রকল্পের ব্যয় সংবাদমাধ্যমে প্রায় ₹২,৯৮৯ কোটি (অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা) বলে উদ্ধৃত, যদিও শুধু নির্মাণ-চুক্তির অঙ্ক ধরলে সংখ্যাটি কম। মূর্তির ব্রোঞ্জ-আবরণ ঢালাই হয়েছিল চিনের জিয়াংশি প্রদেশের একটি ফাউন্ড্রিতে— ভারতে ওই মাপের ঢালাইয়ের সক্ষমতা না থাকায়; লেখকের বিদ্রূপটি তথ্যত সমর্থিত।

যা-ই হোক, মূর্তি বা ভাস্কর্য স্থাপন— দুটোই অস্তিত্ব বজায় রাখার, বা স্মৃতিতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কৌশল করেছে শাসক শ্রেণি।

ভেঙেছে বহু মূর্তি বিদেশে

১) ২০১৬ সালে চিনে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা মাও সে-তুংয়ের, হেনান প্রদেশের একটি খোলা মাঠে স্থাপিত ৩৭ মিটার উঁচু সোনালি রঙের বিশাল আকৃতির মূর্তিটি ভেঙে ফেলা হয়। সরকারের অনুমোদন না নিয়ে মূর্তিটি সেখানে স্থাপন করায় সেটিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে চিনা কমিউনিস্ট সরকারের মুখপত্র পিপলস ডেইলির এক খবরে বলা হয়।[40]

২) ইউক্রেনে লেনিনের সহস্রাধিক মূর্তি ধ্বংস। বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার ছিল ইউক্রেন, আর সেই কারণে ইউক্রেনের আনাচে-কানাচে কমিউনিস্ট নেতা ভ্লাদিমির লেনিনের মূর্তি ছিল অসংখ্য। সোভিয়েত যুগের সব চিহ্ন সরিয়ে ফেলার পাশাপাশি লেনিনের মূর্তিগুলিও

---

[40] সম্পাদকীয় টীকা: হেনান প্রদেশের তোংশু জেলার মাঠে প্রায় ৩৭ মিটার (মতান্তরে ৩৬.৬ মিটার) উঁচু সোনালি মাও-মূর্তিটি স্থাপিত হয় ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের শেষে, এবং সরকারি পরিকল্পনা-অনুমোদন না থাকায় ২০১৬ সালের জানুয়ারিতেই সেটি ভেঙে ফেলা হয়— আন্তর্জাতিক ও চিনা সংবাদমাধ্যমে সমসাময়িকভাবে প্রতিবেদিত।

সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেয় ইউক্রেন সরকার। অনেকেই এই মূর্তি ও স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংসের সমালোচনা করেছেন; তাঁরা বলছেন, এতে শুধু নাম কিংবা ভাস্কর্যই ধ্বংস হচ্ছে না, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সোভিয়েত যুগের ইতিহাসও। সোভিয়েত যুগের পরিসমাপ্তির প্রায় দুই যুগ পরেও ইউক্রেনের বিভিন্ন স্থানে সগর্বে দাঁড়িয়ে ছিল লেনিনের অসংখ্য মূর্তি; কিন্তু ইউক্রেনের বর্তমান সরকার কমিউনিস্ট যুগের এই স্মৃতিচিহ্ন রাখতে মোটেও আগ্রহী নয়। সম্প্রতি ইউক্রেনের শহরে-গ্রামে থাকা ১,৩২০টি মূর্তির সবগুলিই সরিয়ে ফেলেছে সরকার। ২০১৫ সালের মে মাসে ইউক্রেন সরকার সোভিয়েত আমলের সব স্মৃতিচিহ্ন সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়; সিদ্ধান্তটি আইন হিসেবে পাশ করানোর উদ্যোগ নেন প্রেসিডেন্ট পেত্রো পোরোশেঙ্কো।[41]

---

[41] সম্পাদকীয় টীকা: ইউক্রেনের ‘ডিকমিউনাইজেশন’ আইন পার্লামেন্টে পাশ হয় ২০১৫ সালের ৯ এপ্রিল, প্রেসিডেন্ট পোরোশেঙ্কো স্বাক্ষর করেন ১৫ মে ২০১৫। ১,৩২০ সংখ্যাটি ওই আনুষ্ঠানিক ডিকমিউনাইজেশন-পর্বে অপসারিত লেনিন-মূর্তির হিসাব (ইউক্রেনীয় জাতীয় স্মৃতি ইনস্টিটিউট, জানুয়ারি ২০১৭); ১৯৯১ সালে ইউক্রেনে লেনিন-স্মারকের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার, যার বড় অংশ আগের বিভিন্ন পর্বেই অপসারিত হয়েছিল।

৩) ২০১৫ সালে ইরাকের প্রাচীন নিমরুদ নগরী— তিন হাজার বছরের পুরনো ঐতিহাসিক নিদর্শন— গুঁড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাকে যুদ্ধাপরাধ বলে মন্তব্য করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্কৃতি-বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। ইরাকি কর্মকর্তারা জানান, ইসলামিক স্টেটের জঙ্গিরা বুলডোজার দিয়ে শহরের তিন হাজার বছরের পুরনো প্রাচীর ও ভাস্কর্য মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। টাইগ্রিস নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই নিমরুদ ছিল আসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী। ইসলামিক স্টেটের বক্তব্য, এই নিদর্শনগুলি ইসলামসম্মত নয়, তাই এগুলিকে ধ্বংস করা প্রয়োজন। ইউনেস্কোর প্রধান ইরিনা বোকোভা বলেছেন, খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকের এই প্রাচীর ও ভাস্কর্যগুলি ছিল প্রাচীন ইরাকি সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন, এবং সেগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করা যুদ্ধাপরাধেরই শামিল।[42]

---

[42] সম্পাদকীয় টীকা: মূল রচনায় নিমরুদকে একই অনুচ্ছেদে ‘তিন হাজার বছরের পুরনো’ এবং ‘ত্রয়োদশ শতাব্দীর’ বলা হয়েছিল— পরস্পরবিরোধী। টাইগ্রিস-তীরের নিমরুদ ছিল আসিরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী; বসতির সূচনা খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক নাগাদ, আর রাজা দ্বিতীয় আশুরনাসিরপালের আমলে (খ্রিস্টপূর্ব নবম শতক) এটি সাম্রাজ্যের রাজধানী হয়। বর্তমান সংস্করণে তাই ‘খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকের’ পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামিক স্টেট কর্তৃক ধ্বংস (মার্চ ২০১৫) এবং ইউনেস্কোর মহাসচিব ইরিনা

উপরের ঘটনাগুলির উদাহরণ থেকে দেখাই যাচ্ছে, দেশ-কাল-সংস্কৃতি-পাত্র ভেদে মূর্তি বা ভাস্কর্য ভাঙার মধ্যে একটা পরিকল্পিত মতাদর্শ কাজ করেছে, যা সমাজে হিংসার বাতাবরণ তৈরি করে।

বর্তমান সময়ে ভারতে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব

বিজেপি তো কংগ্রেসকে হারিয়ে অনেক রাজ্যেই ভোটে জিতেছে। কিন্তু তার পরে সেখানে জওহরলাল নেহরু বা ইন্দিরা গান্ধীদের মূর্তি ভাঙার কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি![43] তাহলে কেন কোথাও লেনিন, কোথাও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মতো দুই মতাদর্শের অন্যতম প্রধান প্রবক্তাদের মূর্তি ভাঙা হচ্ছে?

বোকোভার 'যুদ্ধাপরাধ' মন্তব্য— দুই-ই যাচাইকৃত।

[43] সম্পাদকীয় টীকা: লেখক-বর্ণিত ২০১৮ সালের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেই অন্তত একটি ব্যতিক্রম নথিভুক্ত— ১৭ মার্চ ২০১৮ পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় জওহরলাল নেহরুর মূর্তিতে কালি ছোড়া হয় (দায় নিয়ে পরস্পরবিরোধী অভিযোগ ওঠে; কংগ্রেস বিজেপিকে দায়ী করে, বিজেপি তা অস্বীকার করে)। পরবর্তী বছরগুলিতেও নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তি বিকৃতির বিচ্ছিন্ন ঘটনার খবর মিলেছে। কংগ্রেস-নেতাদের মূর্তি যে এই পর্বের মতাদর্শগত সংঘাতের প্রধান নিশানা ছিল না— লেখকের এই মূল পর্যবেক্ষণ অক্ষুণ্ণ রেখেই তথ্যটি এখানে লিপিবদ্ধ হল।

স্বাধীনতার আগে থেকেই কংগ্রেস ছিল একটা মঞ্চ— সেখানে যেমন বামপন্থীরা থেকেছেন, তেমনই ছিলেন দক্ষিণপন্থীরাও। তাই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেসই বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ হলেও তাদের সঙ্গে সেভাবে মতাদর্শের লড়াই হয়নি হিন্দুত্ববাদীদের। কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে তাদের চরম মতাদর্শগত বৈরিতা। তাই কেরালায় যা অনেক দিন ধরেই আমরা দেখছি— দুই মতাদর্শের লড়াই— এবার সেটাই কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরার মতো জায়গাতেও।

এটা যে দুই মতাদর্শগত বিরোধের প্রকাশ, তা ঠিক। কিন্তু এর মধ্যে পরমত-অসহিষ্ণুতাই বেশি প্রকাশ পাচ্ছে— অন্য মতের আদর্শিক নেতাদের মুখ দেখবই না— এ রকম একটা চিন্তা প্রকাশ পাচ্ছে। এটাই সবচেয়ে ভয়ের; এর থেকেই সামাজিক বৈরিতার সৃষ্টি।

অনেকে বলছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরেও তো সেখানে লেনিনের মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, সেখানে লেনিনকে দেখা হত রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক হিসেবে। ত্রিপুরায় লেনিন তো রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক ছিলেন না; সেখানে তিনি মতাদর্শের প্রতীক। মূর্তি ভাঙা বা তাকে কেন্দ্র করে মতাদর্শগত সংঘাতের অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ কতটা ছড়িয়ে পড়বে, তা বলা কঠিন।

কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে বৌদ্ধিক পর্যায়ে দুই মতাদর্শের মধ্যে সেই সংঘাত চলতেই থাকবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

অধ্যায় ৫ — সংবাদমাধ্যমে অনাবিল সেনগুপ্ত

প্রকাশিত রচনা, জনপরিসরে উপস্থিতি ও গণমাধ্যমে প্রতিফলন[44]

অনাবিল সেনগুপ্তের জনপরিচিতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বাংলা সংবাদমাধ্যমে তাঁর ধারাবাহিক উপস্থিতি। তিনি কেবল সংবাদপত্রে মতামতধর্মী নিবন্ধ লিখেছেন তা-ই নয়; বিভিন্ন সময়ে তাঁর সামাজিক কর্মকাণ্ড, গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ, জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রচার, বিজ্ঞানমনস্কতা আন্দোলন এবং প্রশাসনিক ও মানবিক উদ্যোগও সংবাদমাধ্যমে স্থান পেয়েছে। এর ফলে তিনি একজন লেখক, গবেষক, প্রকৌশলী এবং বিজ্ঞানমনস্ক সমাজকর্মী হিসেবে স্বতন্ত্র পরিচিতি লাভ করেন।

সংবাদপত্রে তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের লেখক নন; বরং বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, পরিবেশ,

[44] সম্পাদকীয় টীকা: এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জিমূলক তথ্যাবলি— কোন পত্রপত্রিকায় কোন রচনা প্রকাশিত বা উল্লিখিত হয়েছে ইত্যাদি— লেখকের নিজস্ব সংগ্রহ ও নথিপত্র থেকে সংকলিত হিসেবে উপস্থাপিত; বিশদের জন্য গ্রন্থের সম্পাদকীয় নীতি সংক্রান্ত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজনীতি নিয়ে লিখেছেন ধারাবাহিকভাবে।

সংবাদপত্রে লেখালেখির সূচনা

প্রকৌশলী হিসেবে কর্মজীবনের পাশাপাশি অনাবিল সেনগুপ্ত বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে লেখা শুরু করেন। প্রথম দিকের লেখাগুলিতে বিজ্ঞানমনস্কতা, কুসংস্কার, সামাজিক বৈষম্য এবং জনস্বাস্থ্যের মতো বিষয় বেশি গুরুত্ব পায়। পরবর্তীকালে তাঁর লেখার বিষয়বস্তু আরও বিস্তৃত হয়ে শিক্ষা, ইতিহাস, পরিবেশ, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তথ্য ও পরিসংখ্যানের ব্যবহার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি সরকারি রিপোর্ট, গবেষণাপত্র, আন্তর্জাতিক সংস্থার তথ্য এবং সংবিধানের বিধান উদ্ধৃত করে নিজের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা

বাংলা ভাষার অন্যতম প্রভাবশালী সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকা-য় অনাবিল সেনগুপ্তের একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

“সাপের কামড়ে মৃত্যুর কারণ ও প্রতিরোধ” — এই প্রবন্ধে তিনি ভারতের সর্পদংশন-পরিস্থিতির বিশদ বিশ্লেষণ করেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল—

- ভারতে সর্পদংশনের প্রকৃত পরিসংখ্যান
- WHO-এর গবেষণা
- অ্যান্টি-স্নেক ভেনম
- Rule of 100
- ওঝা ও গুণিনের ক্ষতিকর ভূমিকা
- গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা

তিনি দেখিয়েছেন, অধিকাংশ মৃত্যু বিষের কারণে নয়, বরং চিকিৎসায় বিলম্বের কারণে। প্রবন্ধটি জনস্বাস্থ্য-সচেতনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

আজকাল

“দুই বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব” — এই প্রবন্ধে তিনি বাংলা নববর্ষের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন। আলোচিত বিষয়—

- বঙ্গাব্দ
- সম্রাট আকবর

- ফসলি সন
- দুই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য
- ধর্মনিরপেক্ষ উৎসবের ধারণা

এটি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচিত।

গণশক্তি

“ইতিহাসে, শিক্ষায় বিকৃত ভাষ্য” — এই প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেন—

- ইতিহাস-বিকৃতি
- শিক্ষানীতি
- পাঠ্যপুস্তক
- মতাদর্শ
- ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি

প্রবন্ধটি সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনামূলক আলোচনার জন্য পরিচিত।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

“বৃহৎ পুঁজির দায়বদ্ধতায়ই নীতি রূপায়ণের ধারাবাহিকতা” — এটি তাঁর অন্যতম দীর্ঘ গবেষণাধর্মী রচনা। এই প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন—

- করোনা অতিমারি
- লকডাউন
- কর্পোরেট অর্থনীতি
- রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা
- বেসরকারিকরণ
- শ্রমনীতি
- কৃষি
- স্বাস্থ্যব্যবস্থা
- শিক্ষা
- মানব উন্নয়ন

প্রবন্ধটিতে ব্যবহৃত হয়েছে বহু সরকারি ও আন্তর্জাতিক তথ্য।

পূর্বের কলম

উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত গবেষণার অংশবিশেষ পূর্বের কলম পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়।

এই সময়

এই সময় পত্রিকায় তাঁর জনস্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে সর্পদংশন, বিজ্ঞানমনস্কতা ও কুসংস্কার-বিষয়ক লেখাগুলি উল্লেখযোগ্য।

সংবাদ প্রতিদিন

২০১৯ সালে সংবাদ প্রতিদিন-এ একটি মানবিক ঘটনার প্রতিবেদনে অনাবিল সেনগুপ্তের নাম উল্লেখ করা হয়।

ঘটনার সারাংশ— এক অসহায় অসুস্থ মহিলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য অনাবিল সেনগুপ্ত সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেন। সেই পোস্ট দেখে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও সৌমেন বণিক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিকিৎসা, ওষুধ, ওয়াকার এবং সরকারি সহায়তার ব্যবস্থা করেন।

সংবাদে অনাবিল সেনগুপ্তকে একজন উদ্যোগী সামাজিক কর্মী হিসেবে উল্লেখ করা হয়, যিনি সমস্যাটি প্রশাসনের নজরে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

একদিন

সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিদিন

বিজ্ঞান, সমাজ এবং জনজীবন নিয়ে লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

লিটল ম্যাগাজিন

লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর বহু গবেষণাধর্মী নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

- **Science and Belief** — বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পর্ক
- **RSS on Education** — ভারতের শিক্ষানীতি
- **Bengali New Year** — বাংলা নববর্ষের ইতিহাস
- **Air Pollution and Corona Pandemic** — বায়ুদূষণ ও করোনা

সমকালীন দেশকাল

এই সাময়িকীতে তাঁর একাধিক বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম

এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে তাঁর সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা "জ্ঞান ও বিজ্ঞান"-এ তাঁর গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলা উইকিসোর্স

"অলৌকিক নয়, লৌকিক" গ্রন্থের নতুন সংস্করণের ভূমিকায় তাঁর নাম উল্লেখ রয়েছে। এটি যুক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ সম্পৃক্ততার একটি নথিভুক্ত উল্লেখ।

সামাজিক মাধ্যম

ফেসবুকে অনাবিল সেনগুপ্ত নিয়মিত দীর্ঘ গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশ করেন। তাঁর লেখার বিষয়— বিজ্ঞান, ইতিহাস, সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা, পরিবেশ, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা ও যুক্তিবাদ। তাঁর বহু লেখা পরবর্তীকালে সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে।

ইউটিউব

তাঁর ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে বিজ্ঞান, সমাজ, ইতিহাস ও যুক্তিবাদভিত্তিক বিষয় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ দেখা যায়।

লেখালেখির সামগ্রিক মূল্যায়ন

উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অনাবিল সেনগুপ্তের সাংবাদিকতামূলক ও গবেষণামূলক লেখালেখির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়—

- তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ;
- সরকারি ও আন্তর্জাতিক সূত্র ব্যবহারের প্রবণতা;
- বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা;
- সংবিধান ও মানবাধিকারের আলোকে সামাজিক বিষয়ের বিশ্লেষণ;
- জনস্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানমনস্কতার উপর বিশেষ গুরুত্ব;

- দীর্ঘ গবেষণাধর্মী নিবন্ধ রচনার দক্ষতা।

তাঁর লেখাগুলি সংবাদপত্রের প্রচলিত মতামত-কলামের সীমা অতিক্রম করে গবেষণা, জনশিক্ষা এবং সমাজসচেতনতার এক ধারাবাহিক প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

অধ্যায় ৬ — প্রকাশিত গ্রন্থ, গবেষণা ও বৌদ্ধিক অবদান

প্রকাশিত গ্রন্থ, গবেষণা, নির্বাচিত প্রবন্ধ এবং অনাবিল সেনগুপ্তের বৌদ্ধিক অবদান।[45]

ভূমিকা

একজন লেখকের মূল্যায়ন কেবল তিনি কতগুলি লেখা প্রকাশ করেছেন, তার উপর নির্ভর করে না। বরং গুরুত্বপূর্ণ হলো তিনি কোন বিষয় নিয়ে লিখেছেন, কী ধরনের গবেষণা করেছেন, সমাজে তাঁর লেখার প্রভাব কতখানি এবং তিনি জনবিতর্কে কী ধরনের বৌদ্ধিক হস্তক্ষেপ করেছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনাবিল সেনগুপ্তের লেখালেখি মূলত জনবিজ্ঞান (Public Science), জননীতি (Public Policy), ইতিহাসচর্চা, যুক্তিবাদ, সংবিধান, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

---

[45] সম্পাদকীয় টীকা: এই অধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি ও জীবনীমূলক তথ্য লেখকের নিজস্ব নথি এবং মূল উৎস-আর্কাইভ থেকে সংকলিত (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট খ)। এই ভুক্তিগুলি লেখকের বক্তব্য হিসেবে অবিকৃত রাখা হয়েছে; কেবল বানান, সংখ্যা ও গদ্যভঙ্গি হালকা হাতে পরিমার্জন করা হয়েছে।

তাঁর প্রকাশিত লেখা, সংবাদপত্রের কাটিং, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, বই এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, তাঁর রচনাসম্ভার কেবল মতামতধর্মী নয়; বরং বাংলা ভাষায় তথ্যনির্ভর সমাজবিশ্লেষণের একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।

গ্রন্থ

১. বিজ্ঞানের বিশ্বাস এবং...

প্রকাশক: Little Magazine Library & Research Center **ধরন**: প্রবন্ধসংকলন / বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ বিষয়ক গ্রন্থ

এই গ্রন্থে বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পর্ক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রমাণ, যুক্তি এবং কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন, বিজ্ঞান কোনো মতবাদ নয়; এটি জ্ঞান অর্জনের একটি পদ্ধতি, যেখানে প্রশ্ন, পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং সংশোধনের সুযোগ থাকে।

গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে—

- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি
- Hypothesis ও Theory-এর পার্থক্য
- বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রকৃতি

- বিশ্বাস বনাম প্রমাণ
- কুসংস্কারের সামাজিক প্রভাব
- যুক্তিবাদী দর্শন ও সমালোচনামূলক চিন্তার গুরুত্ব

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে সাধারণ পাঠকের জন্য রচিত গ্রন্থ হিসেবে এটি উল্লেখযোগ্য।

গবেষণামূলক প্রবন্ধ

১. বৃহৎ পুঁজির দায়বদ্ধতায়ই নীতি রূপায়ণের ধারাবাহিকতা (২০২০)

এটি অনাবিল সেনগুপ্তের অন্যতম বৃহৎ গবেষণাধর্মী রচনা। প্রবন্ধটি করোনা অতিমারি এবং ভারতের অর্থনৈতিক নীতিকে কেন্দ্র করে লেখা।

আলোচনার বিষয়—

- লকডাউন
- বেসরকারিকরণ
- রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা
- কর্পোরেট অর্থনীতি
- শ্রম আইন
- স্বাস্থ্যনীতি ও শিক্ষা

- অর্থনৈতিক বৈষম্য
- মানব উন্নয়ন সূচক
- কর্পোরেট কর
- নির্বাচন ব্যয়
- নীতি আয়োগ ও CSR

প্রবন্ধে WHO, UNDP, World Bank, RBI, Election Commission, Oxfam এবং একাধিক সরকারি রিপোর্টসহ বহু উৎস ব্যবহার করা হয়েছে।

২. মূর্তি ভাঙা: মতাদর্শের লড়াই?

এই গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম এবং সংস্কৃতির আলোকে মূর্তি ভাঙার ঘটনাগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে—

- বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি
- বাবরি মসজিদ
- লেনিন
- আম্বেদকর
- পেরিয়ার

- শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
- ইউক্রেন
- মাও সে-তুং
- ইসলামিক স্টেট ও তালিবান
- মতাদর্শগত সংঘাত

এই লেখায় লেখক ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্বের আলোকে ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

৩. ইতিহাসে, শিক্ষায় বিকৃত ভাষ্য

এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে ইতিহাসচর্চা, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষানীতি, মতাদর্শ, ইতিহাস বিকৃতি এবং সমালোচনামূলক শিক্ষা।

৪. দুই বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব

এই প্রবন্ধে বাংলা নববর্ষের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে।

মূল আলোচ্য—

- আকবর
- বঙ্গাব্দ

- ফসলি সন
- বাংলা সংস্কৃতি
- ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব

৫. বিজ্ঞান ও বিশ্বাস

এই লেখায় আলোচনা করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক সত্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং প্রমাণ।

৬. শিক্ষায় আরএসএস

এই গবেষণায় ভারতের নতুন শিক্ষানীতি এবং ইতিহাস শিক্ষার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. করোনা ও বায়ুদূষণ

এই প্রবন্ধে পরিবেশবিজ্ঞান এবং জনস্বাস্থ্যের আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা

অনাবিল সেনগুপ্তের লেখার অন্যতম শক্তিশালী অংশ জনস্বাস্থ্য।

সাপের কামড়

তাঁর সবচেয়ে আলোচিত জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ। এতে তিনি তুলে ধরেছেন

—

- Rule of 100
- ASV (Anti-Snake Venom)
- WHO-এর নির্দেশিকা
- বিষধর সাপের পরিচয়
- সঠিক চিকিৎসা
- ওঝার কাছে যাওয়ার ক্ষতি
- আইনি ব্যবস্থা

এই বিষয়ে তাঁর লেখা সংবাদপত্র, লিফলেট এবং সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে।

পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা

তিনি লিখেছেন বায়ুদূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা এবং শিল্প দূষণ নিয়ে।

শিক্ষা

তাঁর লেখায় শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি আলোচনা করেছেন শিক্ষানীতি, ইতিহাস শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং গবেষণা নিয়ে।

ধর্মনিরপেক্ষতা

তাঁর বহু লেখার কেন্দ্রীয় বিষয়। তিনি লিখেছেন সাম্প্রদায়িকতা, সংবিধান, নাগরিক অধিকার এবং উৎসব প্রসঙ্গে।

যুক্তিবাদ

তাঁর অধিকাংশ গবেষণার মূল ভিত্তি। আলোচিত বিষয়—

- অলৌকিকতা
- কুসংস্কার
- তান্ত্রিক ও ওঝা
- ভূত
- বিজ্ঞান

সমাজবিজ্ঞান

তিনি সমাজবিজ্ঞানের বিষয়েও লিখেছেন—যেমন জাতপাত, বৈষম্য, মানবাধিকার, নারী, সংখ্যালঘু এবং রাজনৈতিক সহিংসতা।

অর্থনীতি

গবেষণার অন্যতম বিষয়—কর্পোরেট, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, শ্রমনীতি, কর, নির্বাচনী অর্থনীতি এবং বৈষম্য।

ইতিহাস

তিনি ইতিহাস নিয়ে ধারাবাহিক গবেষণামূলক লেখা লিখেছেন। বিষয়—নববর্ষ, ভারতীয় ইতিহাস, মতাদর্শ, শিক্ষা, উপনিবেশ এবং স্বাধীনতা আন্দোলন।

গবেষণার পদ্ধতি

অনাবিল সেনগুপ্তের গবেষণার অন্যতম বৈশিষ্ট্য—

- Primary Source ব্যবহারের চেষ্টা
- সরকারি তথ্য
- আন্তর্জাতিক রিপোর্ট

- বৈজ্ঞানিক গবেষণা
- আদালতের রায়
- ঐতিহাসিক নথি
- পরিসংখ্যান

বাংলা ভাষায় অবদান

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানমনস্ক, তথ্যনির্ভর এবং গবেষণাধর্মী জনপ্রিয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর কাজ একটি উল্লেখযোগ্য ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি জটিল বিষয়কে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, যাতে সাধারণ পাঠকও বিষয়টি বুঝতে পারেন।

বৌদ্ধিক পরিচিতি

উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অনাবিল সেনগুপ্তকে নিম্নলিখিত পরিচয়ে চিহ্নিত করা যায়—

- সিভিল ইঞ্জিনিয়ার
- গবেষণাধর্মী প্রাবন্ধিক
- বিজ্ঞানমনস্ক লেখক
- যুক্তিবাদী কর্মী

- জনস্বাস্থ্য সচেতনতা প্রচারক
- পরিবেশ বিষয়ক বিশ্লেষক
- সামাজিক ভাষ্যকার
- ইতিহাস ও শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধকার
- মানবতাবাদী চিন্তার সমর্থক

গবেষণার সীমা ও মূল্যায়ন

উপলব্ধ উপকরণ থেকে স্পষ্ট যে অনাবিল সেনগুপ্তের লেখালেখির পরিধি বিস্তৃত এবং বহু মাধ্যমে প্রকাশিত। তবে একটি বিশ্বকোষীয় বা একাডেমিক মূল্যায়নে তাঁর প্রভাব, গ্রহণযোগ্যতা বা অবদানের মাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে স্বাধীন নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁর কাজের উদ্ধৃতি, সমালোচনা বা পর্যালোচনারও প্রয়োজন হবে। বর্তমানে যে তথ্য পাওয়া গেছে, তার ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, জনস্বাস্থ্য ও সমাজনীতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখে চলেছেন এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকী ও প্রকাশনায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এই তথ্যভিত্তিক অবস্থানই একটি নিরপেক্ষ জীবনীতে সবচেয়ে উপযুক্ত।

উপসংহার

এই সংকলনের প্রবন্ধগুলিকে যদি একটি সুতোয় গাঁথা যায়, সেই সুতোর নাম যুক্তিবাদ। ধর্ম হোক বা জনস্বাস্থ্য, রাজনৈতিক অর্থনীতি হোক বা মূর্তি ভাঙার রাজনীতি—লেখক প্রতিটি বিষয়ের কাছে একই প্রশ্ন নিয়ে গিয়েছেন: প্রমাণ কী বলছে? কোন দাবি যাচাইযোগ্য, আর কোনটি কেবল বিশ্বাস বা অভ্যাসের জোরে টিকে আছে? পশুবলির নৈতিকতা থেকে সাপের কামড়ের চিকিৎসা, করোনাকালীন অর্থনৈতিক নীতির অভিমুখ থেকে মূর্তি ভাঙার মতাদর্শগত সংঘাত—আপাতভাবে বিচ্ছিন্ন এই বিষয়গুলিকে একত্র করে একটিই দৃষ্টিভঙ্গি: কুসংস্কার, আবেগ বা কর্তৃত্বের বদলে সাক্ষ্য ও যুক্তিকে সিদ্ধান্তের ভিত্তি করা।

এই অর্থে প্রবন্ধগুলি নিছক মতামত নয়; এগুলি বাংলার এক কর্মরত বিজ্ঞান-প্রচারকের জনপরিসরে সক্রিয় অংশগ্রহণের দলিল। এগুলি সংবাদপত্রের পাতায়, ছোট কাগজে, লিফলেটে ও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকা হস্তক্ষেপের স্মারক—যেখানে একজন লেখক বিমূর্ত তত্ত্বে না থেমে সমকালীন ঘটনার ভিতরেই যুক্তিবাদের অনুশীলন করতে চেয়েছেন। এখানে জনস্বাস্থ্যের পরিসংখ্যান, আদালতের রায়, আন্তর্জাতিক রিপোর্ট ও ঐতিহাসিক নথি পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য এক ভাষায়।

কিন্তু যুক্তিবাদের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হলো নিজের ওপরে তাকে প্রয়োগ করা। যে মানদণ্ডে লেখক অন্যের দাবি যাচাই করেছেন, সেই একই মানদণ্ড এই বইয়ের দাবিগুলিরও প্রাপ্য। সেই কারণেই এই সংস্করণে যুক্ত হয়েছে একটি স্বাধীন তথ্য-যাচাই কাঠামো—যার বিস্তারিত পরিশিষ্ট ক-তে দেওয়া আছে। পাঠককে আমরা আহ্বান জানাই: এই বইকেও সন্দেহাতীত সত্য হিসেবে না নিয়ে, বরং প্রশ্ন করে, উৎস মিলিয়ে, প্রমাণের নিরিখে পড়ুন। কারণ যুক্তিবাদ কোনো সিদ্ধান্তের নাম নয়; এটি অবিরাম যাচাইয়ের এক পদ্ধতি। লেখক নিজে সারা জীবন যে অভ্যাসের পক্ষে সওয়াল করেছেন, এই বই পড়ার সময় সেই অভ্যাসটিকেই সজীব রাখা—এটুকুই এই সংকলনের প্রতি সবচেয়ে বড় সম্মান।

পরিশিষ্ট ক — তথ্য-যাচাই টীকা প্রসঙ্গে

এই সংস্করণের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো এর সম্পাদকীয় তথ্য-যাচাই কাঠামো। মূল প্রবন্ধগুলিতে ছড়িয়ে থাকা প্রায় আশিটি যাচাইযোগ্য দাবি—পরিসংখ্যান, তারিখ, আইনি অবস্থান, চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্য এবং ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ—২০২৬ সালে এই সংস্করণের জন্য স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করা হয়েছে। প্রতিটি দাবি প্রাথমিক উৎস (primary source) এবং নির্ভরযোগ্য গৌণ উৎসের (reputable secondary source) বিপরীতে মিলিয়ে দেখা হয়েছে—সরকারি নথি, আদালতের রায়, আন্তর্জাতিক সংস্থার রিপোর্ট, পিয়ার-রিভিউড গবেষণা এবং প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন।

এই যাচাইয়ের একটি স্পষ্ট নীতি অনুসরণ করা হয়েছে: **মূল রচনার পাঠ অবিকৃত রাখা হয়েছে, যেমনটি প্রকাশিত হয়েছিল।** কোথাও লেখকের বক্তব্য, যুক্তি বা মতামত পরিবর্তন করা হয়নি। কেবল যেখানে যাচাই কোনো তথ্যকে সমর্থন করেছে, সংশোধনের ইঙ্গিত দিয়েছে, বা কোনো দাবির উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি—সেখানে **সম্পাদকীয় টীকা** যোগ করা হয়েছে। এই টীকাগুলি লেখকের মতামতের বিচার করে না; কেবল যাচাইযোগ্য তথ্যের

বর্তমান অবস্থা পাঠকের সামনে রাখে। “যাচাই করা যায়নি” বলতে দাবিটি মিথ্যা তা বোঝায় না; বরং তা প্রকাশ্য উৎসের সীমাবদ্ধতাকেই নির্দেশ করে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংশোধন সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়। নাইন-ইলেভেন হামলায় নিহতের প্রামাণ্য সংখ্যা ২,৯৭৭, ২,৯৯৭ নয়। বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি সংক্রান্ত UNESCO-র বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি আসলে মূর্তি ধ্বংসের (২০০১) পরে, ২০০৩ সালে দেওয়া হয়েছিল—আগে নয়। করোনাকালীন প্রবন্ধে উল্লিখিত ওষুধটির সঠিক নাম হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন (hydroxychloroquine)। বৈষম্য-সংক্রান্ত যে Oxfam-পরিসংখ্যান একটিমাত্র সমীক্ষা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে ২০১৭ থেকে ২০২০ সালের একাধিক Oxfam রিপোর্ট থেকে সংগৃহীত। ভারতের out-of-pocket স্বাস্থ্যব্যয়ের হার সংশ্লিষ্ট সময়ের National Health Accounts অনুযায়ী মোট স্বাস্থ্যব্যয়ের প্রায় ৫৫–৬৫ শতাংশ, প্রবন্ধে উল্লিখিত ৯০ শতাংশ নয়। এবং ধর্মীয় পশুবলির আইনি অবস্থান জাতীয়ভাবে নিষিদ্ধ নয়; তা রাজ্যভেদে ভিন্ন এবং এখনও আদালতে বিচারাধীন (sub judice)।

এই সংশোধনগুলি লেখকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নয়; বরং লেখক নিজে জীবনভর যে প্রমাণনির্ভর যুক্তিবাদী মানদণ্ডের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, এই

যাচাই সেই মানদণ্ডেরই সম্প্রসারণ। নিরপেক্ষ, শ্রদ্ধাশীল এই কাঠামোটি পাঠক ও লেখক উভয়ের প্রতি একই দায়বদ্ধতা পালন করে—তথ্যের প্রতি বিশ্বস্ততা।

পরিশিষ্ট খ — উৎস ও সম্পাদকীয় নীতি

প্রধান উৎস। এই সংকলনের মূল উপাদান দুটি উৎস থেকে সংগৃহীত: `Complete_Conversation_Archive.txt` এবং পূর্ববর্তী Master Manuscript। সংকলনের সময় উৎসে উপস্থিত পুনরাবৃত্ত অংশগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে এবং ছড়িয়ে থাকা লেখাগুলিকে বিষয় অনুসারে পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।

এই সংস্করণের সংযোজন। মূল উৎসে চিকিৎসা, আইন, পরিসংখ্যান ও সমকালীন রাজনীতিসংক্রান্ত দাবিগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি বলে উল্লেখ ছিল। এই সংস্করণে সেই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে: পরিশিষ্ট ক-তে বর্ণিত পদ্ধতিতে দাবিগুলি স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়েছে এবং প্রয়োজনমতো সম্পাদকীয় টীকা যুক্ত হয়েছে। মূল রচনার পাঠ অবশ্য অবিকৃত রাখা হয়েছে।

সম্পাদনা নীতি।

- মূল বক্তব্য ও লেখকের স্বর অক্ষুণ্ণ রাখা।
- বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়বিন্যাস এবং অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি অপসারণ।
- Unicode বাংলা হরফ, A5 পৃষ্ঠা এবং রঙিন অধ্যায়-উদ্বোধনী পৃষ্ঠা।

- সম্ভাব্য তথ্যগত ত্রুটি নীরবে বদলে না দিয়ে উৎসপাঠের ঐতিহাসিক চরিত্র রক্ষা করা; যাচাইয়ের ফল কেবল সম্পাদকীয় টীকায় নথিভুক্ত করা।

শিরোনাম প্রসঙ্গে। এই খণ্ডের প্রচলিত শিরোনাম «যুক্তির আলোয় — বিজ্ঞান, সমাজ ও যুক্তিবাদ (প্রথম খণ্ড)» সম্পাদকীয়ভাবে নির্ধারিত; এটি লেখকের কোনো মূল রচনায় প্রদত্ত শিরোনাম নয়, বরং সংকলনের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলির সমন্বিত বিষয়ধারা থেকে গৃহীত।

তথ্যসূত্র

নিচের তালিকাটি সম্পাদকীয় তথ্য-যাচাই টীকাগুলিতে ব্যবহৃত প্রকৃত উৎসের একটি নির্বাচিত সংকলন, বিষয় অনুসারে বিন্যস্ত। প্রতিটি ভুক্তির URL ২০২৬ সালের অনুসন্ধানকালে সক্রিয় ছিল।

আইন ও আদালত

1. LiveLaw — "Supreme Court Issues Notice On PIL Seeking Ban On Animal Sacrifices For Religious Rituals," মার্চ ২০২৬। https://www.livelaw.in/top-stories/supreme-court-issues-notice-on-pil-seeking-ban-on-killing-of-animals-in-the-name-of-religion-animal-sacrifice-temple-hindu-rituals-526187
2. Library of Congress — "India: High Court of Himachal Pradesh Bans All Religious Forms of Animal Sacrifice in the State," ২০১৪। https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2014-10-06/india-high-court-of-himachal-pradesh-bans-all-religious-forms-of-animal-sacrifice-in-the-state
3. EastMojo — "Animal sacrifice resumes in Tripura temples as SC stays HC order," ২০১৯।

https://eastmojo.com/news/2019/11/25/animal-sacrifice-resumes-in-tripura-temples-as-sc-stays-hc-order/

4. LiveLaw — “SC Stays Orissa HC’s Ban On Bird/Animal Sacrifice During ‘Chatar Yatra’,” ২০২০। https://www.livelaw.in/top-stories/sc-stays-orissa-hcs-ban-on-birdanimal-sacrifice-during-chatar-yatra-164660

5. India Code — Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, ১৯৫৪। https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1412

6. PRS India — The Drugs and Cosmetics (Amendment) Act, ২০০৮। https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_parliament/2008/the-drugs-and-cosmetics-(amendment)-act,-2008.pdf

7. CaseMine — “Section 303 IPC Declared Unconstitutional” (*Mithu v. State of Punjab*, ১৯৮৩)। https://www.casemine.com/commentary/in/section-303-ipc-declared-unconstitutional:-a-landmark-judgment-on-capital-punishment-and-judicial-discretion/view

8. Business Today — “Supreme Court quashes MHA order to pay full salaries during coronavirus lockdown,” ২০২০।

https://www.businesstoday.in/latest/economy-politics/story/supreme-court-quashes-mha-order-to-pay-full-salaries-during-coronavirus-lockdown-258536-2020-05-18

9. The Wire — "Special Court Acquits All 32 Accused in Babri Demolition Case," ২০২০। https://m.thewire.in/article/law/babri-demolition-case-special-court-verdict

জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

10. WHO — "Study estimates more than one million Indians died from snakebite envenoming over past two decades," ২০২০। https://www.who.int/news/item/10-07-2020-study-estimates-more-than-one-million-indians-died-from-snakebite-envenoming-over-past-two-decades

11. eLife — Suraweera et al., "Trends in snakebite deaths in India from 2000 to 2019," ২০২০। https://elifesciences.org/articles/54076

12. PLOS Neglected Tropical Diseases — Mohapatra et al., "Snakebite Mortality in India: A Nationally Representative Mortality Survey," ২০১১।

https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371%2Fjournal.pntd.0001018

13. PLOS Neglected Tropical Diseases — “Hiss and tell: What influences venom yields of India’s big four snakes?” https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371%2Fjournal.pntd.0013676
14. National Health Mission — National Snakebite Management Protocol / Quick Reference Guide । https://nhm.gov.in/images/pdf/guidelines/nrhm-guidelines/stg/Snakebite_QRG.pdf
15. WHO/SEARO — “Guidelines for the Management of Snakebites,” 2nd Edition । https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/india/health-topic-pdf/who-guidance-on-management-of-snakebites.pdf
16. NPR — “India Reverses Export Ban On Hydroxychloroquine Following Trump Pressure,” ২০২০ । https://www.npr.org/2020/04/08/830205883/india-reverses-export-ban-on-hydroxycloroquine-other-drugs-following-trump-press

17. Al Jazeera — “India lifts drug export ban after Trump’s ‘retaliation’ threat,” ২০২০। https://www.aljazeera.com/news/2020/4/7/india-lifts-drug-export-ban-after-trumps-retaliation-threat
18. Business Standard — “Bengal Chemicals gets license to produce hydroxychloroquine,” ২০২০। https://www.business-standard.com/article/pti-stories/bengal-chemicals-gets-license-to-produce-hydroxychloroquine-120041100014_1.html
19. ORF — “National Health Accounts: Public spending finally overtakes out-of-pocket spending.” https://www.orfonline.org/expert-speak/national-health-accounts-public-spending-finally-overtakes-out-of-pocket-spending
20. World Bank Data — “Out-of-pocket expenditure (% of current health expenditure), India.” https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.OOPC.CH.ZS?locations=IN
21. Business Standard — “Govt aims to raise health services expenditure to 2.5% of GDP by 2025,” ২০১৯।

https://www.business-standard.com/article/current-affairs/govt-aims-to-raise-health-services-expenditure-to-2-5-of-gdp-by-2025-119070200962_1.html

অর্থনীতি ও সরকারি তথ্য

22. PIB — "Corporate tax rates slashed to 22% for domestic companies and 15% for new manufacturing companies," ২০১৯। https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1585641

23. Business Standard — "Unemployment rate at four-decade high of 6.1% in 2017-18: NSSO survey," ২০১৯। https://www.business-standard.com/article/economy-policy/unemployment-rate-at-five-decade-high-of-6-1-in-2017-18-nsso-survey-119013100053_1.html

24. PIB — "Aatma Nirbhar Bharat Package – Progress So Far," ২০২০। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1660691

25. PRS India — "Analysis of the Aatma Nirbhar Bharat Abhiyaan," ২০২০। https://prsindia.org/policy/report-summaries/analysis-aatma-nirbhar-bharat-abhiyaan

26. Business Standard — “Privatisation push: Cabinet approves strategic sale of BPCL, 4 other PSUs,” ২০১৯। https://www.business-standard.com/article/economy-policy/privatisation-push-cabinet-approves-strategic-sale-of-bpcl-4-other-psus-119112100076_1.html

27. Business Today — “Centre puts up 23 PSUs for strategic disinvestment,” ২০১৯। https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/centre-puts-up-23-psus-for-strategic-disinvestment-to-meet-budget-target/story/367636.html

28. Business Standard — “RBI approves a record Rs 1.76 trillion surplus transfer to government,” ২০১৯। https://www.business-standard.com/amp/article/economy-policy/rbi-approves-a-record-rs-1-76-trillion-surplus-transfer-to-government-119082601296_1.html

29. Oxfam India — “Time to Care” (Davos প্রেস রিলিজ), ২০২০। https://www.oxfamindia.org/press-release/timetocare-india

30. Business Standard — “India’s top 1% owns half of national wealth; bottom 60% just 4.8%: Oxfam,” ২০১৯। https://www.business-standard.com/article/current-affairs/i

ndia-s-top-1-owns-half-of-national-wealth-bottom-60-just-4-8-oxfam-119012100055_1.html

31. Centre for Media Studies (CMS) — “Poll Expenditure: The 2019 Elections” (রিপোর্ট PDF)। https://cmsindia.org/sites/default/files/2019-05/Poll-Expenditure-the-2019-elections-cms-report.pdf

32. UN in India — “India makes modest progress in 2019 Human Development Report.” https://india.un.org/en/163171-india-makes-modest-progress-2019-human-development-report

ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক ঘটনা

33. UNESCO World Heritage Centre — “Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley” (inscribed ২০০৩)। https://whc.unesco.org/en/list/208/

34. Wikipedia — “Buddhas of Bamiyan.” https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhas_of_Bamiyan

35. Britannica — “How Many People Were Killed in the September 11 Attacks?” https://www.britannica.com/topic/How-many-people-were-killed-in-the-September-11-attacks

36. Wikipedia — “Demolition of the Babri Masjid.” https://en.wikipedia.org/wiki/Demolition_of_the_Babri_Masjid
37. Wikipedia — “Demolition of monuments to Vladimir Lenin in Ukraine.” https://en.wikipedia.org/wiki/Demolition_of_monuments_to_Vladimir_Lenin_in_Ukraine
38. Wikipedia — “Nimrud.” https://en.wikipedia.org/wiki/Nimrud
39. Wikipedia — “Statue of Unity.” https://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Unity
40. Al Jazeera — “Bangladesh: Lady Justice statue removed after protests,” ২০১৭। https://www.aljazeera.com/news/2017/5/26/bangladesh-lady-justice-statue-removed-after-protests
41. Britannica — “Bhagat Singh.” https://www.britannica.com/biography/Bhagat-Singh

সংবাদ প্রতিবেদন

42. Scroll.in — “Tripura: Lenin statue knocked down in Belonia town,” ২০১৮। https://scroll.in/latest/870940/tripura-alleged-bjp-workers-vandalise-lenin-statue-in-belonia-town
43. Tribune India — “2 Lenin statues pulled down in Tripura,” ২০১৮। https://www.tribuneindia.com/news/archive/nation/2-lenin-statues-pulled-down-in-tripura-554008
44. The News Minute — “Periyar statue vandalised in Tamil Nadu, hours after post on BJP leader’s FB page,” ২০১৮। https://www.thenewsminute.com/article/periyar-statue-vandalised-tamil-nadu-hours-after-post-bjp-leaders-fb-page-77535
45. Scroll.in — “Statue of BR Ambedkar vandalised in Meerut after Lenin and Periyar,” ২০১৮। https://scroll.in/latest/871138/statue-of-ambedkar-vandalised-in-meerut-after-lenin-and-periyar
46. The Indian Wire — “Syama Prasad Mookerjee’s Statue Vandalized in Kolkata; 7 arrested,” ২০১৮।

https://www.theindianwire.com/politics/syama-prasad-mookerjees-statue-vandalized-kolkata-7-arrested-52241/

47. Tribune India — “Black ink thrown at Nehru’s statue in West Bengal town,” ২০১৮। https://www.tribuneindia.com/news/archive/nation/black-ink-thrown-at-nehru-s-statue-in-west-bengal-town-559274

48. Deccan Herald — “Put cash in people’s hands to revive economy: Abhijit Banerjee,” ২০২০। https://www.deccanherald.com/india/put-cash-in-peoples-hands-to-revive-economy-abhijit-banerjee-833702.html

যুক্তির আলোয়

ধর্মের নামে পশুবলি থেকে সাপে কাটার চিকিৎসা, করোনা-কালের অর্থনীতি থেকে মূর্তি ভাঙার রাজনীতি — এই সংকলনের প্রবন্ধগুলি বাংলার সংবাদপত্রে প্রকাশিত একজন যুক্তিবাদী কলমের দীর্ঘ লড়াইয়ের দলিল। বিজ্ঞানের আলোয় সমাজকে দেখা, প্রশ্ন করতে শেখা, এবং প্রমাণের দাবিতে অনড় থাকা — এই তিনটি সূত্রেই বাঁধা প্রতিটি লেখা। এই সংস্করণে মূল রচনা অবিকৃত রেখে যুক্ত হয়েছে স্বাধীন তথ্য-যাচাই টীকা ও তথ্যসূত্র — যুক্তিবাদের মানদণ্ড বইটির নিজের উপরেও প্রযুক্ত।

> *"ব্যক্তিকে সহজেই হত্যা করা যায়, কিন্তু আদর্শকে হত্যা করা যায় না।"*

এই খণ্ডে

- ◆ পশুবলি: ধর্ম, নৈতিকতা ও যুক্তি
- ◆ সাপের কামড়: বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য
- ◆ বৃহৎ পুঁজির দায়বদ্ধতায়ই নীতি রূপায়ণের ধারাবাহিকতা
- ◆ মূর্তি ভাঙা: মতাদর্শের লড়াই?
- ◆ সংবাদমাধ্যমে ও প্রকাশনায় লেখকের কর্মজীবন
- ◆ স্বাধীন তথ্য-যাচাই পরিশিষ্ট ও তথ্যসূত্র

অনাবিল সেনগুপ্ত — সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞান-লেখক ও যুক্তিবাদী কর্মী। আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল, গণশক্তি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ-সহ বাংলার প্রধান দৈনিকগুলিতে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে।